শতদ্রুর সন্ধ্যা

সুশীল জানা

পপুলার লাইব্রেরী
১৯৫/১বি, বিধান সরণি, কলি-৬

প্রথম প্রকাশ
জুলাই ১৯৬১

প্রকাশক
সুনীলকুমার ঘোষ এম. এ.
পপুলার লাইব্রেরী
১৯৫/১বি, বিধান সরণি, কলিকাতা-৭০০০০৬

মুদ্রক
সতীশচন্দ্র সিকদার
বন্দনা ইম্প্রেশন প্রাঃ লিঃ
৯এ, মনোমোহন বসু স্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০০০৬

শতদ্রুর সন্ধ্যা

গুরু রাম সিং

হীরা সিং

লেহ্না সিং
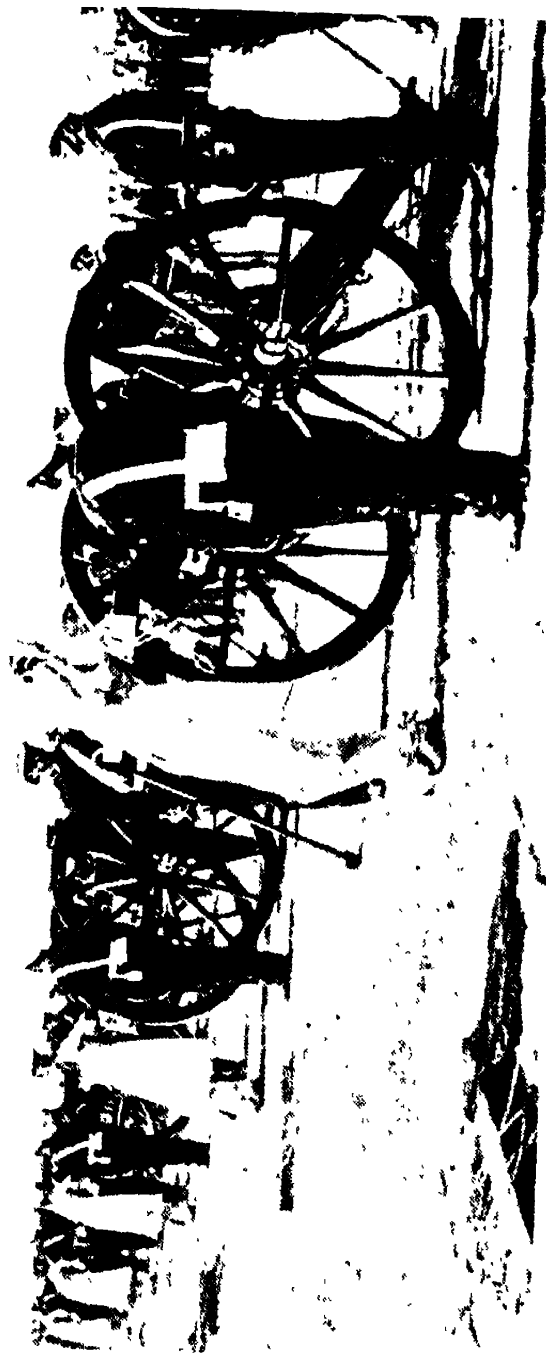
ভেরেশচাগিনের আঁকা কামান দাগার ছবি

খালসা বীর

পঞ্জাবকেশরী রণজিৎ সিংহের জ্বালা সমৃদ্ধি ও স্বাধীনতার পঞ্চপ্রদীপের আলো তখন পাঁচ নদীর তীরে তীরে নিভু নিভু। লাহোর দরবার ফিরিঙ্গীর বুটের তলায়। সেখানে তখন ভিড় চাটুকার আর যত অর্থপদলোভী ভাগ্যান্বেষীর।

শুধু মাথা নোয়ায়নি রণজিতের গড়া দুঃসাহসী খালসা বাহিনী। রণজিৎ সিংহের বিধবা, রানী ঝিন্দন বাঈ তখনও বেঁচে। তাঁকে ঘিরে ছন্নছাড়া, রণক্লান্ত খালসা বাহিনী আবার গড়ে উঠতে লাগল নতুন করে, একান্ত গোপনে।

কিন্তু সে খবর গোপন রইল না ইংরেজ শিবিরের চর-গোয়েন্দাদের কাছে। বড়লাট লর্ড ডালহাউসী হুংকার দিয়ে উঠল এই জাত-যোদ্ধা ও বিদ্রোহীদের উদ্দেশে :

"...আগের এত সব লড়াইয়েও ওদের শিক্ষা হয় নি ; আবার যুদ্ধ চায় শিখেরা। আমি শপথ করে বলছি—যুদ্ধসাধ ওদের মেটাবো, এবার মোক্ষম ভাবেই মেটাবো।"...

খালসার যুদ্ধসাধ মেটাবার জন্য তৈরী হতে লাগল বিশাল ফিরিঙ্গী বাহিনী। সময়টা ঘনঘোর শীতকাল। ১৮৪৯ সাল। খৃষ্টমাসের ভোজ আর পবিত্র ভজন-পর্ব সমাধা করে, ভারী ভারী গরম পোশাকে-আসাকে, কামানে-বন্দুকে সুসজ্জিত হয়ে বিদ্রোহী খালসা বাহিনীকে চিরদিনের মতো গুঁড়িয়ে দেওয়ার জন্য ফিরিঙ্গীরা অগ্রসর হলো উত্তর পঞ্জাবের দিকে। গোয়েন্দাদের খবর : রানী ঝিন্দনবাঈ হাজারা জেলার শাসনকর্তা ছত্তর সিংয়ের ছেলে শের সিংয়ের সহায়তায় বিদ্রোহী খালসা বাহিনীকে আবার সংগঠিত করছে।

সুরু হলো ফিরিঙ্গী অভিযান। দিনের পর দিন সারা দিনমান ধরে চলে কুচকাওয়াজ করা সুসজ্জিত ফিরিঙ্গী সেনার দল। রসদ আর বারুদের গাড়ি, ভারী ভারী কামানের সারি টেনে নিয়ে চলে বেতনভুক গুর্খা আর হিন্দুস্থানী সিপাহীর দল। ওদের কলকল কথাবার্তা, অশ্বারোহী বাহিনীর ঘোড়ার পায়ের খটাখট্ শব্দ আর গাড়ির চাকার ঘড়ঘড় আওয়াজে পঞ্জাবের গ্রাম-প্রান্তরের নিঃশব্দ পথঘাট যেন চমকে চমকে উঠতে লাগল।

সেদিন সন্ধ্যার একটু পরে ভারী কামান টানা একটা দেশোয়ালী সিপাহীর দল এক জঙ্গলের প্রান্তে একটু জিরোতে বসেছিল। কিন্তু ক্লান্ত দেহ নিয়ে জিরোতে বসলে আবার ঠাণ্ডায় জমে যাওয়ার মতো অবস্থা। দু'চার জন সেপাই আশপাশ থেকে কিছু কাঠকুটো শুকনো পাতা হাতড়ে এনে আগুন জ্বেলে দিল। শ্রমে আর শীতে কাবু দলটার সবাই ঘিরে বসল। হাত-পা সেঁকতে লাগল। ওদের মধ্যে আছে গুর্খা, মুসলমান, হিন্দুস্থানী পুরবিয়া।

কিন্তু আরাম আয়েসের ভাগ্য ওদের সইলো না। হাত-পা খানিক সেঁকতে না সেঁকতে একেবারে ঘাড়ের ওপর এসে দাঁড়াল খবরদারী দলের দুই অশ্বারোহী ফিরিঙ্গী ডিক আর টম। দেশোয়ালী সিপাহীদের এই অবস্থায় দেখে ঘোড়া থেকে টপ্ করে নেমে এল ডিক। এইসব বেতনভুক আরামপ্রিয় দেশোয়ালী ভাইদের সঙ্গে কি রকম আচরণ করতে হয় ডিক জানে—আজ দশ বছর সে ভারতবর্ষে আছে। ঘোড়া থেকে নেমেই সে সোজা দু'পায়ে সবুট লাথি ছুঁড়তে লাগল দেশোয়ালীদের উদ্দেশে :

'ইউ লেজি সোয়াইন্স্...গেট আপ...গেট আপ। উঠো জল্দি। আভি পাকড়ো রশি, গিধ্‌ধোড় কাঁহাকা।'...

এতগুলো দেশোয়ালীর পক্ষে ডিকের মাত্র ছুটো পা যথেষ্ট নয়। ডাক দিল টমকে—বললে, 'জাস্ট কিক্ দেম টম্—কিক্ দেম, লাগাও লাথ।'

টম নতুন—সবে সে এদেশে পা দিয়ে বাহিনীতে ঢুকেছে। ডিকের তৎপরতা সে ফ্যাল ফ্যাল করে দেখতে লাগল।

ডিক একাই যেন একশ'। তার দাপটে সব হিন্দুস্থানী দেশোয়ালী ছুটোপুটি করে ছিটকে গেল, কেউ প্রায় আগুনে মুখ থুবড়ে পড়ো পড়ো।

একজন গায়ের ধুলো ঝাড়তে ঝাড়তে দাঁত বের করে হেসে বলল, 'বহুৎ জাড়া সাহাব। তাই একটু হাত-পা সেঁকে নিচ্ছিলাম।'

'হোয়াট !' ডিক গর্জন করে উঠল, 'টোমাদের ভাল ভাল জামা পোশাক ডেওয়া হইয়াছে, পেট ভরিয়া খানা দেওয়া হইয়াছে, মাস মাস মাহিনা ভি খাই-টেছ—তবু জাড়া ! বেগার ইণ্ডিয়ান। উঠো—জলদি কামানের রশি ধবো, না হয় এখুনি গুলি করিব। উঠো—টানো। আজ যেমন করিয়া হোক চেনাবের ঘাঁটিতে পঁহুচাইটেই হইবে।'

চন্দ্রভাগাকে বলে ওরা চেনাব—বোধ করি উচ্চারণে জিভ ওল্টায় না।

দেশোয়ালী সিপাহীর দল দূরপাল্লার ভারী কামানটার রশি আবার টেনে ধরলো—কেউ কেউ ঠেলা মারলো।

ডিকের গব্‌গরানি তখনো থামেনি—বলে চলেছে, 'গরু খাইবে না তো গা গরম হইবে কিসে ? বাছুরকা মাফিক শুধু ডুড্ খাইবে ! টানো—টানো।'—

টানা আর ঠ্যালা খেয়ে বিশালকায় কামানটার মোটা লোহার চাকা ক্যাঁচ-কোঁচ শব্দে আর্তনাদ করে উঠলো।

ওদের রওয়ানা করে দিয়ে ডিক আর টম ঘোড়ায় চড়ে ধীর কদমে এগিয়ে গেল।

পাথুরে সড়ক—সোজা চলে গেছে উত্তরমুখো চন্দ্রভাগার দিকে। সড়কের ডাইনে-বাঁয়ে খাঁ খাঁ করছে শূন্য প্রান্তর। সেখানে কুয়াশা জমে আছে শাদা ঘন ধোঁয়ার মত।

শীতটাও পড়েছে বড় জবর। ঘনঘোর পৌষ। দুরন্ত রাক্ষসী শীত তার তুষার ধবল জটা ছড়িয়ে নেমে আসছে উত্তরের হিমালয় শিখর থেকে। ওদিকে পশ্চিমে হিন্দুকুশ পর্বতমালার হাড় কাঁপানো হিমেল নিঃশ্বাসে সর্ সর্ শব্দে ঝরে পড়ছে গাছের পাতা। খর বইছে উত্তর-পশ্চিমের হাওয়া—কেমন একটা নিরবচ্ছিন্ন শাঁ শাঁ শব্দ উঠছে বাজরা জোয়ারের শূন্য ক্ষেতে—কখনো জোরে হিসিয়ে উঠছে কান্নার মতো। ও যেন পঞ্জাবের ভাগ্যলক্ষ্মী ! ন্যাড়া হয়ে যাচ্ছে অরণ্যের

গাছপালা—বিরাট বিরাট গাছগুলো ডাইনীর মত আকাশের দিকে বাড়িয়ে দিয়েছে ডালপালার কঙ্কাল। নিঃশব্দে প্রবাহিত উত্তর পঞ্জাবের চন্দ্রভাগার সুনীল জলরাশি জমে শাদা হতে যা বাকি। শুধু তুষারপাতটাই যা ঘটছে না—কিন্তু হিমেল ঘন কুয়াশায় জল মাটি পাহাড় আকাশ একাকার।

টম আর ডিকের সারা অঙ্গ জুড়ে যথাযোগ্য গরম পোশাক, মাথায় টুপি। শুধু অনাবৃত মুখে এসে লাগছে কন্‌কনে হাওয়ার ঝাপট। ডিক বুকের পকেট থেকে তামাকের পাইপ বের করে ধরালো। বেশ খুশ মেজাজে টমকে বলল, 'চমৎকার সন্ধ্যা। দিব্যি "হোম হোম" লাগছে—কি বল টম।'

শীতের দেশের মানুষ এই রকম কড়া শীতে ওদের স্বদেশের কথা মনে পড়াই স্বাভাবিক। টম আবার সদ্য-আগত—তার মনে ভেসে ওঠে স্কটল্যাণ্ডের এমনি অরণ্য প্রান্তর পাহাড়ী পথ। মৃদুকণ্ঠে বলল, 'ঠিক বলেছ।'

প্রাণ খুলে ওরা ওদের স্বদেশের ভাষায় আলাপ করতে করতে চললো।

ডিক উচ্ছ্বসিত হয়ে বলল, 'আমাদের এই লড়াইয়ের আয়োজনটা একেবারে যথার্থ সময়েই করা হয়েছে। আমাদের জেনারেল স্যার হিউজ গগ্‌কে অসংখ্য ধন্যবাদ।'

টম বোকার মত বলে উঠল, 'কেন এ কথা বলছ? লড়াইয়ের সময় অসময় কী!'

ডিক হা হা করে হেসে বলল, 'দেখলে না, শীতে দেশোয়ালীগুলো কেমন জড়োসড়ো। তবু তো ওদের কিছু পোশাক-আসাক আমরা দিয়েছি। আর বিদ্রোহীদের তো কথাই নেই—একেবারে নাঙ্গা বলতে পারো। শুধু ওদের মাথায় পাগড়ি আর মুখভর্তি বিরাট বিরাট দাড়ি আছে মাত্র—ব্যস্। শীতেই ওরা আদ্দেক কাবু হয়ে যাবে। জেনারেলের চমৎকার পরিকল্পনা।'

টম বলল, 'আমার এক মাসতুতো ভাই এখানে বহুদিন ছিল—দেশে থাকতে তার কাছে শুনেছিলাম এদেশের লোকগুলো ভয়ানক সাংঘাতিক এবং মরীয়া। এই দেশের কোথায় আমাদের বেশ বড় দরের দু'জন ভদ্রলোককে নাকি রাস্তাতে খুন করে দিলে।'

'ওহো, তুমি মিঃ ভ্যান্স এ্যাগ্নু আর লেফটেন্যান্ট এ্যাণ্ডারসনের কথা বলছো বোধ হয়।' ডিক বলল, 'কথাটা ঠিক। মুলতানের দেওয়ানটা বিদ্রোহীদের সঙ্গে যোগ দিয়ে গড়বিড় করছিল। তাকে শায়েস্তা করবার জন্যই ওঁরা দু'জন মুলতানের দিকে রওয়ানা হয়েছিলেন। তারপর পথে ওই গুপ্ত হত্যা!'…একটু থেমে ডিক আবার বলল, 'তাও এতদিন আমরা চুপ করে সয়ে এসেছি। শুধু এই শীতটার

জন্য অপেক্ষা করছিলাম। এবার আমাদের পালা। দু'চার দিন পরেই যতো পারো ওই দাড়িওয়ালা মুণ্ডুগুলো কেটে নামাও।'

টম জিজ্ঞেস করল, 'ওদের জেনারেল সম্পর্কে কিছু জান ?'

ডিক আবার হা হা করে হেসে উঠল। বলল, 'ওদের সব বড় বড় জেনারেলকে আমরা টাকা আর কিছু কিছু ফালতু পদমর্যাদায় বশ করেছি—তারা এখন লাহোর দরবারে দিব্যি আমোদে মাতোয়ারা হয়ে আছে। এখন কে একটা ছটর সিংয়ের বেটা শের সিং বিদ্রোহীদের চালাচ্ছে। আর আছে রানী।'

টম বলল, 'শুনেছি রানী নাকি খুব তেজস্বিনী—একেবারে টাইগ্রেস, সাক্ষাৎ বাঘিনী।'

ডিক আবার একচোট হেসে নিয়ে বলে উঠল, 'হাঁ, বাঘিনী বটে তবু তার বাচ্চাকে আমরা কেড়ে রেখে দিয়েছি। বাচ্চাটা নাবালক—দলীপ সিং নাম। তাকে সিংহাসনে বসিয়ে রেখে আমাদের লর্ড কাজ গুছিয়ে নিয়েছেন। আর বাঘিনীটা চাষাভুসোর দুয়ারে দুয়ারে শুনি কেঁদে বেড়াচ্ছে। তাদের উত্তেজিত করছে।'

টম বলল, 'মনে হচ্ছে—এ লড়াইটা ওরা জানপ্রাণ দিয়ে লড়বে।'

'ছোঃ।' ডিক কথাটাকে ফুৎকারে উড়িয়ে দিলে। বলল, 'হেরে হেরে ওদের আর কিছু মনোবল আছে বলে মনে করি না। ফিরোজসায় ওরা পোকার মতো মরেছে, মুড়কিতে মরেছে হাজারে হাজারে, ছিন্নভিন্ন হয়ে গেছে সোবরাঁওর লড়াইয়ে। সাটলেজ (শতদ্রু), বিয়াস (বিতস্তা), রাভির (ইরাবতী) তীর থেকে উৎখাত হয়ে গেছে। লাহোর গেছে, অমৃতসর গেছে, আর ওদের আছে কী! মনে মনে ওরা অর্ধেক মরে গেছে—তার উপর এই শীত, আর আমাদের কামান রাইফেল। এমন অস্ত্রশস্ত্র ওদের নেই বললেই হয়।'

'কামান রাইফেল নেই ?'

'আগে যা ছিল তার বহুৎ আমরা কেড়ে নিয়েছি। রাজার বিরাট এক বাহিনী ছিল—নাম ছিল খালসা। বহুৎ জবরদস্ত বাহিনী! সব আমরা ভেঙে দিয়েছি, বরখাস্ত করেছি।'

টম জিজ্ঞেস করল, 'বোধ করি তারাই বিদ্রোহী ?'

'তা বলতে পারো।' ডিক বলল, 'একদম গোঁয়ারের দল—তারা তাদের জেনারেলকেই মানে না। তাদের ধারণা—তারা খুব বীর এবং সাহসী। লড়াই যখন একবার সুরু করে তখন আর থামতে জানে না, জেনারেলের আদেশেও না। বোধ করি ওদের থামাতে পারতো শুধু একজন—আমাদের জেনারেল যদি তাকে ধরতে পারতো। কিন্তু লোকটা ধরার বাইরে।'

'কেন ?'

'কারণ শ'খানেক বছর হবে বোধকরি—লোকটি আর ইহজগতে নেই। ওদের গুরু—নাম গোবিন্দ সিং।' বলে ডিক নিজের রসিকতায় খুব হা হা করে হাসতে লাগল।

কথায় কথায় ওদের পাথুরে সড়ক এসে ঢুকে গেল একটা গিরিসংকটের মধ্যে। সামনেটা ঝাপসা অন্ধকার হয়ে গেল। ঘোড়া দুটোও যেন কেমন ঘাবড়ে ঘাবড়ে এগোতে লাগল। খানিকটা গিয়ে আর যেন এগুতে চাইল না। পেটে বুটের ঠোক্কর দিয়ে ওরা ঘোড়া দুটোকে জোর করে এগিয়ে নিয়ে গেল। গিরিসংকটের মধ্যে দিয়ে সড়কটা চলে গেছে গুজরানওয়ালার দিকে। খানিকটা জোর জবরদস্তিতে এগিয়ে পায়ে কি যেন ঠেকে ঘোড়া দুটো হঠাৎ লাফিয়ে উঠে পেছু হটে এল।

টমের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি। ঘোড়ার পায়ের তলার দিকে তাকিয়ে বলে উঠল, 'তাকিয়ে দেখ ডিক। বোধ করি কোনো দুর্ঘটনা ঘটে থাকবে।'

ডিক ঘোড়া থেকে লাফিয়ে নামলো তো নামলো একেবারে এক দেশোয়ালী সিপাহীর মৃত দেহের ওপরে। অস্ফুট কণ্ঠে বেরিয়ে এল ঈশ্বরের নাম, 'মাই গড।'

টমও নেমে পড়েছে ঘোড়া থেকে একটু তফাতে। সেও বলে উঠল, 'মাই গড। এখানে আরও ক'টা! ওই দেখ ডিক—একটা গাড়ি উলটে আছে।'

'মাই গড। এ যে আমাদের মাস্কেট বোঝাই গাড়ি।' ডিক আঁৎকে উঠল, 'লুট—সব লুটে নিয়ে গেছে।' সভয়ে একবার চারদিকে তাকাল ডিক। দু'পাশে গিরিসংকটের পাথুরে দেওয়াল—অন্ধকারে চেয়ে আছে যেন দৈত্যের মত।

'টম, কুইক। জল্‌দি চলো লেফটেন্যান্টের কাছে। বোধকরি গোটা দলটাই মরেছে।'

অন্ধকারে কোথায় কার লাশ পড়ে আছে কে জানে!

এগুতে আর সাহস হলো না। যেদিক থেকে এসেছিল সেই দিকেই আবার বিদ্যুৎবেগে ঘোড়া ছুটিয়ে চলে গেল ওরা। দুজনেরই মনে হয়েছে তখন ভ্যান্স এ্যাগ্নু আর এ্যাণ্ডারসনের অসহায় মৃত্যু। নতুন দেশের নতুন পরিবেশে নতুন মানুষ টম—সে নীরব, স্তব্ধ। কেবল খই ফুটতে লাগল ডিকের মুখে:

'একে যুদ্ধ বলে? ছ্যাঃ ··· যতো গলা-কাটা, খুনে, চোর, শুয়োর।···আর পাজি নচ্ছার এই অলস আরামপ্রিয় দেশোয়ালীগুলো—দিনে দিনে কাজ শেষ করতে জানে না। কাল সকালেই সব কটাকে গুলি করা উচিত। আমি জেনারেলকে বলব। নিশ্চয় ওরা আগুন জেলে এখানে আরাম করছিল।···' আবার কতকগুলো বিশ্রী গালাগালের বৃষ্টি।

অন্যদিকে প্রতিপক্ষের সব তৎপরতা চলেছে এই অন্ধকারেই, হাড়-জমানো শীতে, দৃষ্টি অন্ধ করা ঘন কুয়াশার অন্তরালে। ওরই মধ্যে ইরাবতী চন্দ্রভাগার খেয়াবোটে পার হচ্ছে পদাতিক, অশ্বারোহী, কামান—অধিকাংশই ছোট ছোট। ওদের দূরপাল্লার ভারী কামান নেই বললেই হয়। যা দু-একটা আছে তাই ঠেলে ঠেলে নিয়ে চলেছে চড়াই উৎরাই, পাহাড় প্রান্তর উজিয়ে। জড়ো হচ্ছে চন্দ্র-ভাগার উত্তর তীরে—গুজরাটে। দিনের আলোয় ওদের বিশ্রাম। শত্রুর অত্যন্ত শক্তিশালী দূরবীনেও তখন ধরা পড়ে না একটু নড়াচড়া। শুধু দেখা যায় শূন্য ধূ ধূ প্রান্তর, পাহাড়, অরণ্য। আর দেখা যায় দ্রুত ব্যস্ত চাষীদের—যাদের ফসল তখনো কাটা হয়নি। পড়ি মরি করে কেটে তুলছে ফসল।

খালসাদের একটা দল চন্দ্রভাগার উত্তরে একটা খাড়া চড়াইয়ের মুখে শেষ-রাতের দিকে এসে ঠেকে গেল সেদিন। একটা দূরপাল্লার ভারী কামানকে বহুৎ টানাটানি আর ঠেলাঠেলি করেও ওই চড়াইটুকু পার করতে পারছিল না। সামনে ছোট ছোট পাহাড়ের শ্রেণী—ওরই আড়ালে ওদের যেতে হবে। লোকগুলো হিমসিম খেয়ে হতাশ হয়ে জিরোতে বসল। ওদিকে পুবের আকাশ ফর্সা হয়ে এল।

এমন সময় সেই পথে এসে পৌঁছলো হাবিলদার দরবারা সিংয়ের দল। কামান ঠেলা দলটাকে বসে থাকতে দেখে ঘোড়া থেকে সে নেমে পড়ল।

দরবারা সিং দীর্ঘকায় শিখ—চওড়া কাঁধ। মাথায় পাগড়ি থাকলেও কানের পাশ থেকে দেখা যায় পাকা চুলের গুচ্ছ—দাড়ি কাঁচা পাকা চুলে মেশা। বয়স পঞ্চাশ পার হয়ে গেছে।

দরবারা সিংয়ের দেখাদেখি তার দলের সব অশ্বারোহী নেমে পড়ল একে একে।

এই শীতেও দর দর করে ঘামছে কামান-ঠেলা লোকগুলো—কেউ কেউ পাগড়ী খুলে ঘাম মুছছে।

দরবারা বললো, 'কি বেটা, চড়াইটুকু পার হতে পারছ না? ওদিকে ভোর হয়ে এল যে!'

লোকগুলো বিবর্ণ মুখে হাসল। রাতের কঠিন পরিশ্রমের ছাপ ওদের মুখে চোখে। গায়ে শীতের পোশাক বলতে এক চিলতে নেই। ছেঁড়া ময়লা কামিজ, পা-জামা। কারুর জুতো আছে, কারুর স্রেফ নাঙ্গা পা। ভিকের কথা মিথ্যে নয়।

দরবারা হুকুম দিল, 'রশিতে সব ঘোড়া জুড়ে দাও।'

ঘোড়াগুলোকে কামান টানার কাজে লাগিয়ে দেওয়া হলো। তার ওপর এত-গুলো মানুষের হাতের ঠেলা। খাড়া চড়াই পার হয়ে গেল কামানটা।

চড়াই পার হয়ে কামান-ঠেলা লোকগুলো একবার সামনে চেয়ে দেখলো—

পাহাড়ের আড়াল তখনো দূরে। এখনও তাদের অনেকটা পথ ঠেলতে হবে। ক্লান্তির একটা নিঃশ্বাস ফেলে তারা অশ্বারোহীদের ঘোড়াগুলোকে খুলতে গেল।

দরবারা বলল, 'নেহি বেটা। ঘোড়ারা টানুক—তোমরা সঙ্গে চল। সারারাত তোমাদের নিশ্চয় খুব মেহনৎ হয়েছে।'

একজন বলল, 'সর্দারজী, তবে আপনার ঘোড়াটা খুলে দিই—আপনি ঘোড়ায় উঠুন।'

'কাহে বেটা?' দরবারা বলল, 'তোমাদের এ বুড্‌ঢা লড়াই করতে এসেছে যখন—তোমাদের সঙ্গে গুজারাট পর্যন্ত চলতেও পারবে।'

দলটা কামান ঘিরে নীরবে চলতে লাগল হিমেল কুয়াশার ভেতর দিয়ে।

হঠাৎ একজন তরুণ খালসা দরবারাকে জিজ্ঞেস করল, 'চিলিয়ানওয়ালা থেকে আমরা হটে যাচ্ছি কেন? ওখানে তো আমরা জিতেছি।'

'জরুর। জিতেছ বৈকি।'

চিলিয়ানওয়ালার রুক্ষ প্রান্তরে রচনা করেছে ওরা ফিরিঙ্গীদের ভয়ংকর সমাধিভূমি। হত আহত মিলে দু হাজারেরও ওপর, নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে ফিরিঙ্গীর চার-চারটে রেজিমেণ্ট; চারটে কামান এবং বহু অস্ত্রশস্ত্র হস্তগত হয়েছে খালসাদের। সে যুদ্ধের পরিণাম শুনে সাড়া প'ড়ে গেছে খাস ইংল্যাণ্ডে।

তাই প্রশ্ন ওদের স্বাভাবিক।

'কেন ছেড়ে যাচ্ছি চিলিয়ানওয়ালার ঘাঁটি?'

দরবারা সিং বলল, 'রসদের টান বেটা। গুজারাটে তার ঘাটতি হবে না।'

একজনের মনে সন্দেহ। স্পষ্ট বলেই ফেললে, 'আমাদের এবারকার লড়াইয়ের নেতা শের সিং—কিন্তু লোকটা কেমন?'

দরবারা সিং বলল, 'আমরা লড়াই করতে এসেছি বেটা, লড়াই-ই করব জান-প্রাণ দিয়ে। সে যে-ই আমাদের নেতা হোক।'

আর একজন প্রবীণ খালসা বলে উঠল, 'কিন্তু সর্দারজী, লাল সিংয়ের কথা আমরা ভুলিনি। মুড্‌কির লড়াইয়ে যখন আমরা ঠিক জেতার মুখে—ঠিক তখনি সে সরে পড়ল।'

আর এক খালসা বলে উঠল, 'ফিরোজশাতেও বিশ্বাসঘাতক নেতা তেজা সিং হঠাৎ লড়াই ছেড়ে চলে গেল।'

'সোবরাঁওতেও তো একই ব্যাপার।' আর এক খালসা বলে উঠল, 'বিশ্বাসঘাতক সর্দার সেনানায়করা আমাদের কামানের মুখে ঠেলে দিয়ে সরে যায়।'

বিশ্বাসঘাতকতার দীর্ঘ কাহিনী—শুনে শুনে দরবারা সিংয়ের মুখচোখ লাল

হয়ে উঠল। গম্ভীর গলায় বলল, 'সর্দারদের আর বিশ্বাস ক'রো না বেটা। এমন কি, আমাকেও না। লড়াই করতে এসেছ—লড়াই করে যেও। ভুলে যাও শের সিংয়ের কথা—আমাদের রানী এখনও বেঁচে আছেন। একটা ফিরিঙ্গীও যতদিন আমাদের পাঁচ নদীর সীমানায় থাকবে—ততদিন আমাদের লড়াইয়ের শেষ যেন না হয়। বলো—শপথ করো।' বলতে বলতে দরবারা সিং উত্তেজিত হয়ে উঠল। থমকে দাঁড়াল। সামনে ঝুঁকে এক মুঠো কাঁকরমাটি তুলে নিল। গমগমে গলায় বলে উঠল, 'শপথ করো—তোমার দেশের এই মাটি ছুঁয়ে শপথ করো বেটা।'

গোটা দলটা দাঁড়িয়ে পড়েছে—ঘিরে দাঁড়িয়েছে দরবারা সিংকে। সবাই এক এক মুঠো মাটি নিয়ে হাত উঁচু করে বলে উঠল, 'আমরা শপথ করছি।'

অদূরে দেখা যায় চন্দ্রভাগা। দরবারা সেই দিকে লক্ষ্য করে বলল, 'ওই, চন্দ্রভাগা সাক্ষী!'

'হাঁ, চন্দ্রভাগা সাক্ষী।'

'এই মাটি তোমাদের কামিজে রাখ বেটা, বুকের কাছে রাখ—তাকে প্রাণ দিয়ে রক্ষা ক'রো। আমি বুড্‌ঢা হয়ে গেছি, কতদিনই বা বাঁচবো। কিন্তু তোমরা জোয়ান—জান দিয়ে এর মান রেখ বেটা।'

আর কেউ কোনো কথা বলে না। একান্ত নিঃশব্দে দলটা ওদের ভারী কামান আর ঘোড়াগুলো নিয়ে এক সময়ে পাহাড়ের অন্তরালে এসে পৌঁছলো।

সারা দলটার জন্য তখন আরও একটা উৎসাহ ও উত্তেজনার বিষয় অপেক্ষা করে ছিল। পাহাড়ের আশ্রয়ে পৌঁছবার খানিক পরেই খালসা সেনার ছোট একটা দল কতকগুলো পাহাড়ী খচ্চরের পিঠে বস্তায় বাণ্ডিল করে বাঁধা কি সব মাল এনে হাজির করল।

ওদের একজন দরবারার দিকে তাকিয়ে বলল, 'ভাগ্য ভাল সর্দারজী—বহুৎ মাস্কেট বন্দুক মিলে গেল।'

'মাস্কেট! কোথায়?

ওদের মাস্কেটের বড় অভাব।

'যে কোনো একটা বস্তা খুলে দেখুন।'

খালসা জোয়ানরা সকৌতূহলে বস্তা খুলতে লাগল। বস্তায় বস্তায় ঠাসা মাস্কেট আর টোটা।

দরবারার মুখ খুশিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠল। এ জাতের হাতিয়ার তাদের বড় কম। একটা মাস্কেট হাতে তুলে নিয়ে দেখতে দেখতে দরবারা বলল, 'এ যে সব বিলায়তি! কোথায় পেলে বেটা?'

'ফিরিঙ্গীদের কাছ থেকে। লুটে এনেছি সর্দারজী।'

'সাবাস।'

দরবারা ভাবছিল : একদিন এই মাস্কেট ছিল তরুণ খালসাদের হাতে হাতে। ফিরিঙ্গীরা সব কেড়ে নিয়েছে—ভেঙে দিয়েছে বাহিনী। মাস্কেটটা তরুণ খালসাদের হাতে আবার তুলে দিতে দিতে দরবারা বলল, 'এ তোমাদের নয়া জমানার হাতিয়ার—নাও বেটা। আমার জীবন গাঁথা আমার পুরানা সমশেরের সঙ্গে।' বলে কোমরে ঝোলানো দীর্ঘ তরোয়ালের গায়ে একবার সস্নেহে হাত বুলাল।

পর পর পাশাপাশি টিলার মত ছোট ছোট কয়েকটা পাহাড়—গাছগাছালিতে আচ্ছাদিত। তারই অন্তরালে জমায়েৎ হয়েছে হাজার হাজার খালসা। উত্তরে সিন্ধু ঝিলম চন্দ্রভাগা—এমন কি দক্ষিণের ফিরিঙ্গী অধ্যুষিত ইরাবতী শতদ্রুর পার থেকেও গা-ঢাকা দেওয়া বিদ্রোহীদের দল ছুটে আসছে হাজারে হাজারে।

পাহাড়ের দক্ষিণ-পশ্চিম বরাবর ধূ ধূ করছে রুক্ষ শূন্য গুজারাটের প্রান্তর। সেখানে তখন এক মহানাটকের অভিনয় অপেক্ষা করে আছে।

সে মহানাটক সুরু হলো ২১শে ফেব্রুয়ারী, ১৮৪৯ সাল। গর্জে উঠল দু'পক্ষের দূরপাল্লার কামান। কিন্তু এ জাতের অস্ত্রে ফিরিঙ্গীদের শক্তি অনেক বেশী। বিশেষ করে চিলিয়ানওয়ালায় হৃতমান হয়ে ফিরিঙ্গীরা তাদের সমস্ত শক্তি নিয়োজিত করেছে গুজারাট যুদ্ধে। ইতিহাসে এ যুদ্ধ পরিচিত 'কামানের যুদ্ধ' বলে।

এমন যুদ্ধে প্রাণ দিতে চেয়েছিল হাবিলদার দরবারা সিং। সঙ্গী ছিল তার বহু-দিনের লড়াইয়ে বিশ্বস্ত অনুচর অশ্বারোহী দল, সঙ্গী ছিল তার বহু সুতীক্ষ্ণ সমশের, সঙ্গী ছিল তার সাধের ঘোড়া তুফান। ফিরিঙ্গী গোলন্দাজদের গোলার মুখে দাঁড়াতে পারছে না খালসা বাহিনী। সহসা তার চোখে পড়ল ফিরিঙ্গী গোলন্দাজদের একটা দল একটা টিলার আড়াল থেকে সমূহ সর্বনাশের সৃষ্টি করছে। গোলাবৃষ্টির আড়ালে এগিয়ে আসছে একটা ফিরিঙ্গী বাহিনী।···

দরবারা চঞ্চল, দরবারা উত্তেজিত। একবার ফিরে তাকিয়েছিল তার চির বিশ্বস্ত বাহিনীর দিকে। নিজের বুকের কাছে একবার হাত বুলিয়েছিল—সেখানে সযত্নে রাখা ছিল তার সাধের পঞ্জাবের পবিত্র পাঁচনদীর ধোয়া মাটি। অনুচরদের মনে করিয়ে দিয়েছিল সে-কথা :

'শপথ মনে আছে বেটা।'

উত্তর পেয়েছিল মিলিতকণ্ঠে : 'মনে আছে।'

'তবে চলো বেটা। ওই কামানটা আমাদের দখল করতেই হবে।'

কামান লক্ষ্য করে বিদ্যুৎবেগে ছুটলো দরবারা সিংয়ের অশ্বারোহী বাহিনী। উন্মুক্ত কৃপাণ। সবার আগে দরবারার তুফান।

সামনের পদাতিক দেশোয়ালী আর ফিরিঙ্গীগুলোকে ছিন্নভিন্ন করে, শেষ পর্যন্ত সে কামান ওরা দখল করেছিল। কিন্তু সামনের নদীর ঢালের কোন অন্তরাল থেকে ফিরিঙ্গীদের আবার একটা ছোট কামান গর্জন করে উঠল ওদের লক্ষ্য করে। তারপর আরও একটা কামান। গোলা ফেটে পড়তে লাগল আশেপাশে। দরবারার বাহিনীর ঘোড়াগুলো ছিটকে পড়তে লাগল মাটিতে। করুণ হ্রেষাধ্বনি।...

দরবারার তুফান বড় বড় চোখ করে নিমেষে বুঝে নিয়েছিল ব্যাপারটা। তারপর কি হলো তার কে জানে, হঠাৎ সে একবার চীৎকার করে উঠল, 'চি হিঁ... হিঁ।'... না তার আজন্ম মালিককে নিয়ে আর সে এগোল না সামনে। বরং চন্দ্রভাগার ঢালের অন্তরাল দিয়ে ছুটতে লাগল সে পেছনে।

দরবারা প্রাণপণে লাগাম টেনে ধরল তার। চীৎকার করে উঠল, 'তুফান... তুফান ... বেইমানী করিস না ... তুফান !...'

না, তুফান আর ফিরল না। একেবারে নিরাপদ দূরত্বে সওয়ারকে নিয়ে সে পাহাড়ী ঘাঁটির অন্তরালে গিয়ে হাজির হলো।

রক্তাক্ত উন্মুক্ত সমশের।—দরবারা ঘোড়া থেকে নেমেই সেই তরোয়াল তুলে ধরল তুফানের ঘাড়ের বরাবর। চাপা গলায় গর্জে উঠল, 'বেইমান !'..

ঘোড়াটা কি বুঝে হঠাৎ সরে গেল দূরে—সভয়ে মালিকের দিকে বড় বড় চোখে চেয়ে ডেকে উঠল আবার 'চি ... হিঁ—হিঁ ... ।'

দরবারার পা জখম। সেই জখমী পা টেনে টেনে ছুটে গেল ঘোড়াটার দিকে, 'তোকে আজ আমি শেষ করবো বেইমান।'

পেছন থেকে দুজন খালসা সৈনিক ধরে ফেলল দরবারা সিংকে। বলল, 'ওর ওপরে রাগ করছ কেন সর্দারজী। ও তোমাকেই শুধু বাঁচিয়ে নিয়ে ফিরে এসেছে।'

দরবারার গোটা বাহিনীটা নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। তার দলের আর কেউ নেই—আছে শুধু দরবারা সিং আর তুফান।

আহত দরবারা সিং কেমন একরকম আচ্ছন্নের মতো ফিরে এসেছিল বাড়িতে। দু'জন তরুণ খালসা পৌঁছে দিতে এসেছিল। তখন ভোর প্রায় হয় হয়। অত ভোরে তখনো কেউ ঘুম ভেঙে ওঠেনি। দরবারার বাড়ির দরোজা বন্ধ।

কারুকে ডাকাডাকি করতে হলো না। তুফান ডেকে উঠল, চি হিঁ... হিঁ... ঘরে ফিরে এলে এমনি করেই সে ডাক দেয়।

দুদ্দাড় খুলে গেল দরোজা। বাইরে বেরিয়ে এল দরবারা সিংয়ের স্ত্রী রূপান কাউর আর পুত্রবধূ দেবী! দেবী ছুটে গেল ঘোড়ার দিকে।

তরুণ দুই খালসা ধরাধরি করে ঘোড়া থেকে নামাল দরবারা সিংকে। তার পর এক অবাক কাণ্ড করে বসল দরবারা। ঘোড়া থেকে নেমে সক্রোধে হাঁটুর চাপে ভেঙে দু-টুকরো করে ফেললে তার তরোয়ালটাকে। ছুঁড়ে ফেলে দিলে দূরে। বাষ্প রুদ্ধ কণ্ঠে বলে উঠল 'যাঃ তোর আর দরকার কি!'

তুফান বড় বড় চোখ করে দেখল ব্যাপারটা। কি বুঝলো কি জানি– ডেকে উঠল জোরে। বহু লড়াইয়ের সঙ্গী সে—বোধ করি ব্যাপারটা তার ভাল লাগল না।

ঘোড়াটার দিকে কটমট করে চেয়ে আবার যেন ক্ষেপে উঠল দরবারা। দাঁতে দাঁত চেপে গর্জে উঠল, 'ওটাকে চাবকে দূর করে দে—তাড়িয়ে দে, ওর জান্ খতম করে দেবো আমি।' বলতে বলতে কোমরবন্ধে ঝোলানো ছোরা মুঠো করে চেপে ধরল দরবারা, গরগর করে উঠল চাপা ক্রোধে, 'দুশমন! লড়ায়ের ময়দান থেকে ছুটে বেরিয়ে এল—কোনো বাগ মানল না বেইমান। ওকে খুন করবো আমি। আমাকে ময়দানে মরতে দিল না দুশমন!'···

তুফান কান খাড়া করে বড় বড় চোখে তাকিয়েছিল দরবারা সিংহের দিকে। দরবারা রুখে দু'পা এগোতে না এগোতে ঘোড়াটা আশ্চর্যভাবে সরে গেল দেবী কাউরের আড়ালে। দেবী হাত তুলে আগাল করে দাঁড়াল।

দুই তরুণ খালসা ধরে ফেললে দরবারাকে।

দেবী তুফানের ঘাড়ে হাত বুলোতে বুলোতে বলল, 'ও অবোধ জানোয়ার বাবা—ওকে মেরে কি হবে! তুফানকে তুমিও জান, আমিও জানি। ও কখনো বেইমান নয়। যারা আসল বেইমান তাদের তুমি খতম করো।'

'খতম! খতম করবো কাকে?' এবার দরবারার রক্ত চক্ষু বেয়ে জল নেমে এল। অবরুদ্ধ কণ্ঠে বলে উঠল, 'হারে দিয়ান সিংহের বেটি, জানিস তুই—বেইমান তোর ঘরে?'

আর এক লড়াইবাজ খালসা সিপাহীর বেটি দেবী কাউর—শ্বশুরের কথায় লাল হয়ে উঠল তার মুখ চোখ। বলল, 'আমার ঘরে?'

'হাঁ—হাঁ বেটি।' দরবারা গর্জে উঠেছিল, 'সে আমার বেটা, যার সঙ্গে তোর বিয়ে দিয়েছিলাম বেটি—সেই বেইমান পঞ্জাব সিং।'

'বাবা!'··· আর্তনাদ করে উঠল দেবী।

'হাঁ বেটি। বেইমানীতে আমরা হেরে গেলাম··· হেরে গেলাম বেটি—সিরেফ্ বেইমানী।···নইলে রণজিৎ সিংয়ের খালসা বীরদের শিরদাঁড়া ভাঙতো কে!'

বেইমান

রাগ করে দরবারা সিং সিপাহীর সাজ সজ্জা ছুঁড়ে ফেলে দিলে। সারাটা দিন বসে রইল একেবারে ঘরের ভেতরে। এড়াতে চাইল গাঁয়ের মানুষদের। সকলেরই কেউ না কেউ আছে খালসা বাহিনীতে। তারা আত্মীয়স্বজনের খবর শুনতে চায়। লড়াইয়ের খবর জানতে চায়। এ লড়াই তাদের মরমে গাঁথা। বলা যায়—সারা পঞ্জাবের শিখ সম্প্রদায় সৈনিকের জাত। এবং খালসা তাদের কাছে একটা অতি পবিত্র নাম।

এ খালসা বাহিনী স্বয়ং গুরু গোবিন্দ সিংহের হাতে গড়া। সম্রাট ঔরঙ্গজীব তখন দিল্লীর সিংহাসনে—তার হিংস্র আক্রমণের উত্তাল তরঙ্গ বারে বারে ভেঙ্গে পড়ছে শিখ সম্প্রদায়ের উপর। তারই প্রতিরোধে গড়ে উঠেছিল একদিন গুরু গোবিন্দ সিংহের খালসা। পঞ্জাবের ঘরে ঘরে গিয়ে পৌঁছেছিল গুরু গোবিন্দের ডাক: তৈয়ার হো··· তৈয়ার হো খালসা। খালসার চরিত্রে থাকবে সিংহের বিক্রম; সহ্য করবে না সে কোন পীড়ন; নৈতিক ধর্মের প্রতিষ্ঠায় সে

হবে আমরণ যোদ্ধা। দেখতে দেখতে গড়ে উঠল খালসার মৃত্যুভয়হীন বজ্র কঠোর এক চরিত্র। অবলীলায় প্রাণ দিয়েছে কত শিখ, প্রাণ দিয়েছে বান্দা বৈরাগীর মত গুরুও। এমনি করে প্রায় শতাব্দীকাল ধরে গড়ে উঠেছে একটা যোদ্ধার জাত। তাকে শেষ পর্যন্ত সুশৃঙ্খল করে দুঃসাহসী রণনিপুন সৈনিকে রূপান্তরিত করেছিল পঞ্জাবকেশরী রণজিৎ সিংহ।

কিন্তু তাঁর মৃত্যুর পরে দশটা বছর পার হতে না হতে কেমন যেন ছিন্ন ভিন্ন হয়ে গেল সব। তাঁর নিজের হাতে গড়া যে বাহিনীতে ছিল গুর্খা, পাঠান, বিহারী, শিখ একত্রে দলবদ্ধ—হঠাৎ তাদের মধ্যে এসে পড়ল সন্দেহ আর অবিশ্বাস। ভারতের ভাগ্যের আকাশে তখন উদয় হয়েছে ভেদ-পন্থায় সুচতুর ইংরেজ—ফিরিঙ্গী বণিক! দিল্লীর মোগল সিংহাসনও টলোমলো। ঔরঙ্গজেবের সব কাহিনী ম্লান হয়ে গেল ফিরিঙ্গীর ধূর্ততা, শঠতা আর নৃশংসতার কাছে। নানা জাতি-উপজাতির দেশ ভারতবর্ষ—তাদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির অভিসন্ধি ফিরিঙ্গী শাসকের মাথায়, আর দুই হাতে ভরা গোলা গুলি ও ঘুষের থলি। এই নিয়ে একটু একটু করে ছড়িয়ে পড়ল তারা সারা ভারতে, অধিকার করে নিল রাজ্যের পর রাজ্য। কেউ একেবারে শেষ হয়ে গেল লড়াই করে, কেউ দাসখৎ লিখে দিল প্রাণের ভয়ে। এই ভাঙা গড়ার দিনে মাথা উঁচু করেছিল এতদিন রণজিৎ সিংহের পঞ্জাব। সেও গেল। গুজারাটের রণক্ষেত্রে পাতা হয়ে গেল তার শেষ শয্যা।

'কিন্তু খালসা সিপাহী লড়াইতে হারেনি।' দরবারা সিংয়ের এক কথা। জখমী ডান পা-টা দু'হাতে একটু সরিয়ে দিয়ে দেবীকে সে বলছিল যুদ্ধের খবর, 'হেরেছি আমরা ফিরিঙ্গীদের শয়তানী আর লাহোর দরবারের ইয়া বড়াবড়া সর্দারদের বেইমানীর কাছে—বুঝলি বেটি।'

লড়াইয়ের কথা বলছিল দরবারা।

দেবী জিজ্ঞেস করলে, 'তারা কি খালসা নয়?'

'ঝুটা খালসা বেটি—সব বিলকুল ঝুটা। নামে খালসা, কিন্তু আসলে খালসার দুশমন।' দরবারা ফোঁস করে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলল।

'তারা সব কে?'

'রাজা লাল সিং, তেজা সিং, গুলাব সিং।' উত্তেজিত হয়ে উঠে দরবারা বলল, 'এই তিন বেইমান সর্দার ফিরিঙ্গীদের সঙ্গে গোপনে ষড়যন্ত্র করে আমাদের খালসা সিপাহীদের বার বার ঠেলে দিলে কামান বন্দুকের মুখে। নিজেরা রইল পালিয়ে, সিপাহী চালাবে কে? মুডকিতে আমরা হারলাম, ফিরোজশার হারলাম, সোব-রাঁওতে ভি হারলাম।—শতদ্রু পার করে লাহোরের রাস্তা দেখিয়ে দিলে গুলাব

সিং, তার বদলে ফিরিঙ্গীদের কাছ থেকে সে ইনাম বকসিস পেয়ে গেল কাশ্মীরের উপত্যকা। রাজা লাল সিং পেয়ে গেল লাহোর দরবারের মন্ত্রীগিরি। তেজা সিংও রাজা বনে গেল বহুৎ ইনাম পেয়ে। খালসা সিপাহীরা এসব খবর পেয়েছে—কিন্তু অনেক পরে।'

'তো আমার পঞ্জাব সিং কি করল?' সুযোগ বুঝে দরবারার বৌ রূপান কাউর বলে উঠল। এতক্ষণ ঘরের এক কোণে চুপচাপ বসে বসে শুনছিল লড়াইয়ের কথা। আর চুপ করে থাকতে পারল না—বলল, 'আমার পঞ্জাবকে তখন তুমি বেইমান বললে কেন?'

তাকিয়ায় ঠেস দিয়ে আড় হয়ে শুয়ে ছিল দরবারা, উঠে বসলো সিধে। চোখ দুটো হঠাৎ তার লাল হয়ে উঠল। চাপা গলায় গর্জে উঠল দরবারা, 'শুনো বুঢ্‌ঢি—শুনো, তোমার বেটা আরও খারাপ, আরও নিচ। সে বেইমানের নফর—নোকর। দালাল। দাস। ষড়যন্ত্রের খবর সে সব জানত কিন্তু সময় থাকতে সে তার সিপাহী ভাইয়াদের কিছুই জানায়নি। জানালে—ফিরিঙ্গীদের গুলিতে একটা সিপাহী মরবার আগে মরত লাল সিং, তেজা সিং, নিমকহারাম গুলাব সিং। তাই তার মুখ দেখলেও পাপ হয়। বুঝলে? তবে হাঁ—বাড়ি ফিরে এলে সে-ও তোমাকে কিছু বখসিসের ভাগ এনে দেবে—শুঁকে দেখো, তাতে খালসা সিপাহীর রক্তের গন্ধ পাবে।'

দরবারা রাগে গর গর করতে করতে বিছানা ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। জখমী পাটা টেনে টেনে দু-এক পা এগিয়ে গিয়ে কি ভেবে আবার ঘুরে দাঁড়াল ছেলের বৌ দেবী কাউরের দিকে। বলল, 'দেবী, তুই বেটি খালসা সিপাহীর লেড়কি, বোল্‌—তুই কি করবি? আমি জেনেছি—পঞ্জাব বহুৎ টাকা বখসিস্‌ পেয়েছে।'

দেবী কাউর ঝপ্‌ করে শ্বশুরের পা ছুঁয়ে বলেছিল, 'তার ওই ইনাম বখসিস আমার হারাম বাপুজী।'

'বাস্‌ বাস্‌—তু আমার বেটি, তু আমার বেটা, আর আমার কেউ নাই। বাস্‌।'

দরবারা পা টেনে টেনে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। দাওয়ায় গিয়ে বসে রইল চুপচাপ কিছুক্ষণ। মাথায় কেমন একটা যন্ত্রণা—সারা ভেতরটা যেন জ্বলে ওঠে মাঝে মাঝে। লুধিয়ানার এই ছোট্ট গ্রামটা থেকে লাহোর অনেক দূরে—তবু মনে লেগে থাকে লাহোরের ছবি—স্বাধীন রাজপাটের ছবি—উল্লাস, আনন্দ। রণজিৎ সিংহ নেই—তবু ছিল তার নাবালক পুত্র দলিপ সিং, ছিল মা মহারানী ঝিন্দনবাঈ। কে জানে দুশমন ফিরিঙ্গীরা এখন সেখানে কি করছে। মহারানী ঝিন্দন এখন কোথায়? নিশ্চয় তিনি পালাতে পারবেন!—ছটফট করে দরবারা। তার আরও

যন্ত্রণা—ছেলে পঞ্জাব সিংকে নিয়ে। নিশ্চয় সে কয়েক দিনের মধ্যে বাড়ি ফিরে আসবে। তখন ?

চিলিয়ানওয়ালা ও গুজরাটের শেষ শিখ যুদ্ধের পর আরও অনেক খালসা সিপাহী গ্রামে ফিরে এসেছে। তারা নিশ্চয় জেনে গেছে পঞ্জাব সিংহের কথা। দরবারা কি করে তাকাবে তাদের মুখের দিকে !

দরবারার মনে হলো—দু'জন কারা যেন কথা বলতে বলতে তার বাড়ির দিকেই আসছে। বাইরে বসে থাকতে আর সাহস হলো না তার—পা ঘষটে ঘষটে ঘরে ঢুকল। এসে ধপ্ করে শুয়ে পড়ল বিছানায়।

রূপান কাউর এবং দেবী—শাশুড়ী বউ তখনো বসে ছিল গুম্ হয়ে। দরবারাকে হঠাৎ শুয়ে পড়তে দেখে রূপান কাউর উদ্বিগ্ন গলায় জিজ্ঞেস করল, 'কি হলো !'

দরবারা তার কোনো জবাব দিল না—ফিরেও তাকালো না। দেবীকে শুধু বললে, 'কেউ এলে বলবি বেটি আমার শরীর খারাপ।'

'খারাপ !' হঠাৎ রূপান কাউরের চোখ গিয়ে পড়ল জখমী পায়ের দিকে। আঁৎকে উঠল, 'দেবী, শিগ্‌গির পট্টি বদলে দে—জখম থেকে আবার রক্ত গড়িয়ে পড়ছে।'

বিছানার পাশে এসে বসল রূপান কাউর। জিজ্ঞেস করল, 'খুব যন্ত্রণা হচ্ছে ?'

দরবারা চুপ। অন্য দিকে মুখ ঘুরিয়ে থাকল। স্ত্রীর সঙ্গে দরবারা কথাবার্তা বন্ধ করে দিয়েছে।

এ বড় কঠিন যন্ত্রণা। দেহের চেয়েও ঢের বেশী। বেইমানের নফর পঞ্জাব সিংকে ঘিরে দরবারা, রূপান কাউর আর দেবী। এরা কেউ কারুর মুখের দিকে সহজভাবে যেন তাকাতে পারছে না।

খানিক বাদে এসে হাজির হলো দেবীর বাবা ধিয়ান সিং আর ভাই দীপ সিং। কোনো অজুহাতেই দেবী তাদের বাইরে বাইরে ফিরিয়ে দিতে পারল না। বরং শরীর খারাপ শুনে তারা একেবারে অন্দরে ঢুকে দরবারা সিংয়ের বিছানার পাশে এসে বসল।

ধিয়ান সিং জিজ্ঞেস করল, 'জখম কি খুব সাংঘাতিক ?'

শুকনো গলায় দরবারা বলল, 'তেমন কিছু না।'

'গুলি ?'

'হ্যাঁ। পায়ে লাগল—বেরিয়ে গেল এফোঁড় ওফোঁড় হয়ে।' দরবারা নীরস গলায় বলল, 'বুকে লাগলে ভাল হতো।'

'আরে জিন্দা রহো ভাই খাল্‌সা—বাঁচতে হবে একশ' বছর।' ধিয়ান সিং

একটা হাত চেপে ধরল দরবারার। দু'জন ওরা সমবয়সী—দুজনেরই কাঁচাপাকা দাড়ি—আবাল্যের সহচর। বন্ধু। বেয়াই।

'আমরা বেঁচে কি করবো?'

'আবার লড়াই করবো। আমাদের রানী ঝিন্দন এখনও বেঁচে আছেন।'

'আমি ক্ষেত-খামার করবো।' দরবারা গোঁ ভরে বলল।

'ঠিক করে ফেলেছ?'

'হ্যাঁ।' শুকনো গলায় বললে দরবারা, 'আমি খালসা সিপাহী ভাই—আমি লড়াই জানি, বেইমানি জানি না। লাহোর দরবার এখন বেইমানে ভরা। ওদের সঙ্গে পারবো না। কেউ পারবে না।'

দরবারা মনে মনে তৈরী হয়ে রইল—এইবার বোধ করি পঞ্জাব সিংয়ের কথাটা উঠে পড়বে। কিন্তু না, ওরা কেউ তার কথা তুললো না।

দীপ সিং বললে, 'খালসা সিপাহীরা অনেকেই এই কথা বলছে। অনেকেই গ্রামে চলে যাচ্ছে।'

হঠাৎ দরবারা তীব্র কণ্ঠে দীপ সিংকে জিজ্ঞেস করল 'তুমি কি করবে?'

'লড়াই চাই, ফিরিঙ্গীদের শয়তানীর বদলা চাই। জরুর চাই।' দীপ সিং হতাশ গলায় বলল, 'কিন্তু আমাদের নেতা নেই, চরিত্র নেই, ভুল হলে শুধরে দেওয়ার মানুষ নেই। মরবার লোক আছে—কিন্তু গড়ে তুলবে কে?'

'তোমাদের জোয়ান খালসা সিপাহীরা কি সবাই এই রকম হতাশ?' দরবারা সিং জিজ্ঞেস করল।

দীপ সিং বলল, 'জোয়ান খালসারা দিশাহারা। তারা নেতা চায়। লড়াই করে মরতে তারা তৈয়ার।'

দরবারা সিং একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বলল, 'নেতা তোমরা হয়তো একদিন পাবে—আমরা তখন থাকবো না।'

কিছুক্ষণ কথাবার্তা বলে ওরা যাওয়ার জন্যে উঠে দাঁড়াল।

দরবারা সিং বলল 'আর একটা কথা জানতে চাই ধিয়ান, মহারানী ঝিন্দন নিরাপদ?'

'নিরাপদ!' ধিয়ান সিং দীপ সিংকে দেখিয়ে বললে, 'ওরা তাঁকে নিরাপদ জায়গায় সরিয়ে দিয়েছে গুজারাট লড়াইয়ের পর।'

'ফিরিঙ্গীরা ধাওয়া করেনি?'

'করেছিল—সুবিধে করতে পারেনি।'

'তুমি কি করবে এখন ভাবছ?'

'ফিরিঙ্গীরা খালসা বাহিনী ভেঙে দিয়েছে। তা দিক। কিন্তু মহারানী ঝিন্দন যতদিন আছেন—ততোদিন আমি তাঁর খালসা সিপাহী। যেখানেই তিনি থাকুন—ফিরিঙ্গীদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের জন্য যেদিন তিনি ডাক দেবেন ছুটে যাব।'

ধিয়ান সিং হেসে বলল, 'আমার কাজ—তোমাকেও গেঁহুর (গম) ক্ষেত থেকে টেনে নিয়ে তোমার ঘোড়ায় চাপিয়ে লড়াইয়ের ময়দানে সারবন্দি করা। শেষ লড়াইয়ে এক সঙ্গে মরবো। তুমি কি ভেবেছ—আমার সেই ছেলেবেলার দোস্তকে আমি ছেড়ে যাবো? শিগ্‌গির সেরে ওঠো বুঢ্‌ঢা।'

ওরা চলে গেল।

আশ্চর্য! কেউ পঞ্জাব সিংয়ের কথা তুললো না। দরবারার মনে হলো—ওরা সব জানে বলেই ঘৃণায় কথাটা একবারও উচ্চারণ পর্যন্ত করলো না। কী লজ্জা! কী ঘৃণা! ওদের বাপ-বেটার দৃপ্ত ভঙ্গীর দিকে তাকিয়ে দরবারা সিংয়ের চোখ ফেটে জল বেরিয়ে এল। তার পঞ্জাব সিং যদি দীপ সিংয়ের মতো হতো!

সেই পঞ্জাব সিং মাস তিন পরে একদিন এসে পৌছলো বাড়ি। শীতের সন্ধ্যা তখন ঘনঘোর হয়ে এসেছে। সন্ধ্যার অন্ধকারে গা মিশিয়ে পঞ্জাবের ঘোড়া ধবধবে বিজ্‌লী যেন একটা ভুতুড়ে বোঝা নিয়ে এসে দাঁড়ালো বাড়ির সামনে। ডাক দিল—চিঁ-হিঁ-হিঁ-হিঁ।

এ ডাক শুনে সবার আগে ছুটে আসতো যে—সে আজ ঘরের বার হলো না। দরবারা বাড়িতে নেই—ক্ষেত-খামার দেখতে গেছে কিষাণ কামিনদের নিয়ে। বুক কাঁপতে লাগল মা রূপান কাউরের। হাঁটবে কি, পা দুটো হয়ে গেল যেন ভারি পাথর।

পঞ্জাব সিং ঘোড়া থেকে নেমে তাকালো ঘরের দিকে। দরোজা খোলা—ঘরের আলো দেখা যাচ্ছে। কিন্তু কেউ আজ ঘোড়ার কাছে ছুটে এল না। বিজ্‌লীর গায়ে কেউ আজ ছুটে এসে হাত বুলিয়ে দিল না। অথচ আগে প্রতিবারে এমনিই হতো—হাত বুলিয়ে দিত দেবী গায়ে মাথায়। জিন খুলে নিত। স্নান করিয়ে দিত। তাই বোধ করি ঘোড়াটা আবার ডাক দিয়ে উঠলো—চিঁ-হিঁ-হিঁ-হিঁ।...

না, কেউ এল না। সাড়া দিল শুধু তুফান—চিঁ-হিঁ-হিঁ-হিঁ।...

প্রদীপ হাতে মা এসে দাঁড়াল দাওয়ায়।

মনটা খুঁত খুঁত একটু করলেও খুব একটা অভাবনীয় কিছু মনে হয়নি পঞ্জাব সিংয়ের। কিছু দিন আগেও সে চিঠি লিখেছে বাড়িতে—যদিও উত্তর পায়নি।

খারাপ কিছু ঘটলে নিশ্চয় উত্তর পেতো। ইংরেজদের নতুন ব্যবস্থায় নতুন পল্টন বাহিনী তৈরী হচ্ছিল তখন লাহোরে—সেখানে পুরাতন সিপাহী তার বাপের জন্য একটা ব্যবস্থাও সে করেছিল। পল্টন কোম্পানী থেকে চিঠি গিয়েছিল তার বাপের নামে—সে জানে, এবং এও জানে—বয়সের কথা তুলে বাপ তার সে কাজ নেয়নি। তা না নিক—নিশ্চয়ই ভালো আছে। তবু ঘরদোর কেমন থমথমে মনে হয়।

জিনের গায়ে ঝোলানো একটা ঝোলা খুলে নিয়ে পঞ্জাব সিং দাওয়ার দিকে এগোলো।

দাওয়ায় চৌকি পাতা। রুপান কাউর প্রদীপটা চৌকির ওপর বসিয়ে দিয়ে কাঁপা কাঁপা গলায় বলল, 'বস পঞ্জাব—এইখানে বস, একটু জিরো।'

'সব ভালো আছ তোমরা? হর্‌নাম, উধম?'

হর্‌নাম আর উধম পঞ্জাবের দুই ছেলে।

'ভাল আছে বাবা। তুই—তুই কেমন আছিস?' বলতে বলতে আবার গলা কেঁপে গেল রুপান কাউরের।

'খারাপ দেখছ?' পঞ্জাব হাসল।

না। মায়ের চোখে বরং নতুন লাগছে—বড ভাল লাগছে। দীর্ঘ চওডা পঞ্জাব সিংয় লম্বায় বাপের মতই কম্‌সে কম্ সাড়ে ছ'ফুট, পরনে নতুন ধরনের ভারী পোশাক, পায়ে বুট, গায়ে মোটা পশমের লম্বা কোট—যেন মস্ত এক জাঁদরেল। দীর্ঘদেহী জাঠ। পঞ্জাব সিংকে মানিয়েছে ভালো।

মা তাকিয়ে ছিল ছেলের দিকে—ভয়ে আর স্নেহে মেশানো সে এক বিচিত্র দৃষ্টি।

হাতের ঝোলাটা মায়ের হাতে তুলে দিয়ে পঞ্জাব সিং মিটি মিটি হাসতে হাসতে বলল, 'এই নাও তোমার আর তোমার বৌয়ের জিনিস।' বলে গায়ের লম্বা কোটটা খুলতে লাগল।

কিন্তু ঝোলাটা নিয়ে মায়ের হাত তো কেঁপে অস্থির। মনে পড়ে স্বামীর শ্লেষ আর ক্রোধ।

পঞ্জাব সিং বললে, 'খুলে দেখ মা।'

মনে জোর এনে রুপান কাউর ঝোলার ভেতর থেকে জিনিসপত্র টেনে বার করল। সুন্দর সুন্দর পোশাক—মায়ের, বৌয়ের। একটা মোড়ক খুলে ফেলতে বেরিয়ে পডল সোনার দুটো হার।

পঞ্জাব বললে, 'একটা তোমার, আর একটা ··· আচ্ছা মা, দেবী কি বাপের বাড়ি গেছে?'

'না।' একটা ঢোক গিলে রূপান কাউর ডাক দিল, 'দেবী!'

কলের পুতুলের মতো এসে দাঁড়াল দেবী।

পঞ্জাব মৃদু হেসে বললে, 'একটা হার তোমার বৌকে দাও মা।'

মা ভয় ভয় চোখে তাকিয়ে একটা হার গুঁজে দিলে দেবীর হাতে।

দেবী যেন তৈরী হয়ে এসেছিল—চীৎকার করে উঠল, 'তুমি জান—এ আমার হারাম মা ··· আমার হারাম!' বলে হারটা সে ছুঁড়ে ফেলে দিলে মাটিতে।

ঠিক সেই সময়ে এসে দাঁড়াল দরবারা সিং। দাওয়ায় উঠতে উঠতে বললে, 'আরে জাঁদরেল সাহাব!···গরীব খালসার ঘরে!'

দুই হাতে মুখ ঢেকে দেবী ছুটে পালাল।

চৌকি ছেড়ে উঠে দাঁড়াল পঞ্জাব।

দরবারা সকৌতুকে তার আপাদমস্তক দেখতে লাগল—বললে, 'বাহাবা, বাহাবা! এসব বুঝি লাহোর দরবারের নতুন কোম্পানীর পোশাক।' রূপান কাউরকে বললে, 'আরে বুঢ়টি—বাতিটা তুলে ধর, ভালো করে দেখে নিই গরীব খালসা।' জামার কাপড় আঙুল দিয়ে ঘষে ঘষে দেখলে, খাকী পাৎলুনটা পরখ করলে, পশমের মোটা ওভারকোটটা টিপে টিপে দেখলে। বললে, 'সব বিলায়্‌তী মাল। এসব বুঝি ফিরিঙ্গীরা এখন বিলাত থেকে খুব আমদানী করছে?'

দরবারার কথার খোঁচা ঠিক বুঝতে না পেরে পঞ্জাব সিং সহজভাবে বললে 'হাঁ, বিলায়্‌তী মালে লাহোরের বাজার ঠেসে দিয়েছে।'

'হারে আমার দেশোয়ালী তাঁতী!' দরবারার চোখ পড়ল এবার মেয়েদের পোশাকের দিকে। 'আরে আরে—এ কৌন চিজ ··· দেখি দেখি।' প্রায় রূপান কাউরের হাত থেকে কেড়ে নিলে পোশাকগুলো দরবারা—চোখের সামনে মেলে ধরে বলে উঠলো, 'বাহাবা বাহাবা ··· সব বিলায়্‌তী চিজ, দরবারা সিং মরে গেলে এসব দিয়ে রূপান কাউরের ফের সাদী হয়ে যাবে।'

'কী সব তুমি বলছ বাবা!' পঞ্জাব সিং বলে উঠল রাগ করে।

'ঠিক বলছি—ঠিক বাৎ বলছি। রূপান কাউর ফিরিঙ্গীর দাসী হবে। খালসা সিপাহীর বৌও নয়—মাও ভি নয়। হারে গুরু গোবিন্দজির গরীব খালসা!'

'কী যা তা বলছ তুমি বাবা'—রাগ করে পঞ্জাব সিং আবার বলে উঠল, 'আমিও খালসা সিপাহী।'

'তুই খালসা সিপাহী!' দরবারার চোখে এবার আগুন জ্বলে উঠল। ছোবল মারবার জন্যে সাপ যেমন ফণা তুলে রুখে দাঁড়ায় তেমনি করে দরবারা রুখে দাঁড়াল ছেলের দিকে—বলল, 'তুই বেইমান খালসা।'

কথাটা শুনে কেমন যেন থতোমতো খেয়ে গেল পঞ্জাব সিং—বসে পড়ল চৌকির ওপরে। এতক্ষণে যেন বুঝতে পারল—তার ফিরে আসায় কেউ খুশী নয়! মায়ের চোখে মুখে ভয়, দেবী হার ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে গেল 'হারাম' বলে। বাবার কথাগুলো শুরু থেকেই বাঁকা বাঁকা।

পঞ্জাব সিং আস্তে আস্তে বলল, 'কি আমার বেইমানী দেখলে?'

'বেইমানী কী! তুই গুলাব সিংয়ের দেহরক্ষী ছিলি?'

'ছিলাম।'

'লার্ড হার্ডিঞ্জের সঙ্গে গুলাব সিংয়ের কি কথা হয়েছিল?'

'জানি না। আমি দেহরক্ষী মাত্র। বাইরে ছিলাম।'

'লড়াইয়ের আগে ওদের যোগাযোগ হয়েছিল?'

'তা ··· তা হয়েছিল।'

'তারপর লাহোরের রাস্তা ফিরিঙ্গীদের কে দেখিয়েছিল? লাহোরকে ফিরিঙ্গীদের পায়ের তলায় কে বিকিয়ে দিয়েছে? সোবরাওঁর লড়াইয়ে গুলাব সিং কোথায় ছিল? তোর মায়ের পা ছুঁয়ে বলতে পারিস—তুই ষড়যন্ত্রের কথা কিছু জানতিস না?'

'জানতাম,' পঞ্জাব সিং কঠিন গলায় এবার বললে, 'এবং জানতাম—খালসা সিপাহীর বুদ্ধিমান, সুযোগ্য নেতা নেই—তারা হারবে। কোথায় সেই বোম্বাই থেকে সোত্তরখানা বড় বড় নৌকো শতদ্রু দিয়ে যখন সোবরাঁওর দিকে দিনের পর দিন এগিয়ে আসছিল, তোমরা কেউ লক্ষ্যও করোনি। তোমরা বোধ করি ভাবছিলে'—পঞ্জাব সিং ঠাট্টা করে বললে, 'ফিরিঙ্গী বণিকরা ব্যবসা করতে আসছে! সেই সব বোটের পর বোট সাজিয়ে তারা সেতু বানিয়ে শতদ্রু পার হয়েছে। জান?'

'তুই জানতিস—কিন্তু খালসা সিপাহী সাথীদের তুই সে কথা জানিয়েছিলি?'

'কি করবে খালসা সিপাহী!—সে লড়াই করে মরতে পারত, লাহোরকে বাঁচাতে পারত না!'

'তাই তুই বুঝি আগে ভাগে লাহোর দরবারের বেইমানদের দলে ভিড়েছিলি?' রাগে ফেটে পড়লো দরবারা।

পঞ্জাব সিং বেপরোয়া গলায় বললে, 'যারা হারবেই—তাদের দলে থেকে লাভ কী!'

'তোকে আমি খুন করে অন্তত একটা পাপের জঞ্জাল সরাবো বেইমান!'

হঠাৎ কোমরবন্ধ থেকে ছুরি খুলে নিয়ে উন্মত্তের মতো দরবারা ছুটে গেল ছেলের দিকে।

রূপান কাউর ভয়ে ঠক্ ঠক্ করে কাঁপছিল এতক্ষণ—মনে মনে যেন এই রকম একটা মুহূর্তের প্রত্যাশা করছিল সে। ছুটে গিয়ে দরবারাকে আগলে জড়িয়ে ধরল ছেলেকে—হাউমাউ করে উঠল, 'আমার একই বেটা সর্দার—দোহাই তোমার।… দোহাই তোমার।…'

'বেইমান … বেইমান।…' গর্ গর্ করতে করতে দরবারা ছোরাটা আবার খাপে ঢুকিয়ে রাখল। দাঁতে দাঁত চেপে বললে, 'জেনে রাখ পঞ্জাব সিং—মহারানী ঝিন্দন এখনো বেঁচে আছেন। লাহোরকে তিনি ফিরিঙ্গীর পায়ে বিকিয়ে দেবেন না।'

পঞ্জাব সিং নিরুত্তাপ গলায় বললে, 'মহারানী ঝিন্দন ফিরিঙ্গীদের হাতে বন্দী।'

'বন্দী!' চৌকির ওপরে হতাশভাবে ধপ্ করে বসে পড়লো দরবারা। ম্রিয়মাণ গলায় জিজ্ঞেস করল, 'কোথায় বন্দী?'

'চুণার দুর্গে।' এবারে শ্লেষভরা কণ্ঠে পঞ্জাব বলল, 'কি করতে পারবে তোমরা?'

দরবারা কপালের রগ দুটো চেপে ঝিম হয়ে বসে রইল অনেকক্ষণ। তারপর আস্তে আস্তে প্রতিটি কথা স্পষ্ট উচ্চারণ করে করে বললে, 'এর পরে খালসা সিপাহী দরবারা সিং কোনো বেইমানের সঙ্গে এক চালার তলায় বেঁচে থাকতে পারে না।' বলে গট্ গট্ করে ঘরে গিয়ে ঢুকলো।

পেছন থেকে রূপান কাউর ককিয়ে উঠল, 'এ কী বলছ সর্দার … আমাদের একই বেটা!'

'দরোয়াজা বন্ধ করে দাও।'

রুপান কাউর দরোজাও বন্ধ করেনি—প্রদীপও নেভায়নি, বসে বসে ঢুলেছিল সারা রাত। জেগে উঠেছে ক্ষণে ক্ষণে। তবু তারই মধ্যে কখন চলে গেল তার পঞ্জাব সিং কে জানে! কচি দুই ছেলেকে নিয়ে দেবী কাউর নিজের ঘরের খিল এঁটে দিয়েছে। তারও কোনো সাড়া শব্দ নেই। সারা পিম্পল গাঁ তখন ঘুমে নিঃসাড়। শুধু তুফান একবার ডেকে উঠেছিল গভীর রাতে—চিঁ-হিঁ-হিঁ-হিঁ।… কোথায় চললি?

অনেক দূর থেকে সাড়া দিয়েছিল ছুটন্ত বিজ্‌লী—চিঁ-হিঁ-হিঁ-হিঁ। … চলে যাচ্ছি।…
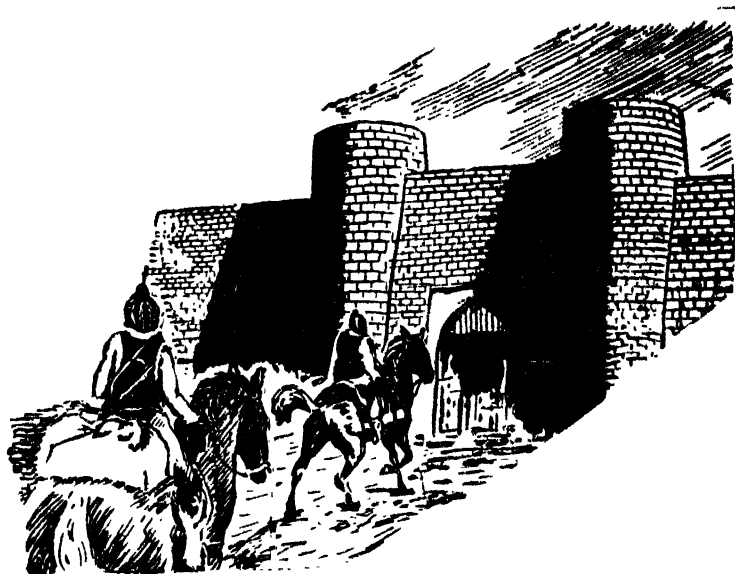
সওদাগর

সকালে উঠে দরবারার প্রথম কাজ হলো—বাইরের দাওয়ায় চৌকির ওপর পড়ে থাকা দুটো বিলাতী কাপড়ের পোশাক পুড়িয়ে ছাই করা। একটা রূপান কাউরের—অন্যটা দেবীর।

পুড়িয়েছে আর ভেবেছে। কি ভেবে হঠাৎ দেবীকে ডেকে বললে, 'দেবী, চরকায় সুতো কাটতে পারিস ?'

'পারি বাবা।' দেবী বললে, 'আমার বাপের বাড়িতে মেয়েরা সবাই সুতো কাটে।'

'কাটবেই তো।' রূপান কাউর বসেছিল গুম্ হয়ে- তার দিকে চোখের কটাক্ষ করে বললে দরবারা, 'জানে না শুধু জমিন্দার কা বেটি।'

'আমি নক্সার কাজও করতে পারি বাবা।' দেবী বললে।

'বহুৎ আচ্ছা।' দরবারা বললে, 'আমি লুধিয়ানার সওদাগরদের, তাঁতীদের কাছ থেকে শাল এনে দেবো।'

দরবারার যে কথা সেই কাজ। ঘোড়া ছুটিয়ে চলে গেল সোজা ছুতোর মিস্ত্রীর বাড়ি। ফিরে এলো দুপুর বেলা—তুফানের দু'পাশে দুটো চরকা আর এক বোঝা তুলো ঝুলিয়ে।

এতেও সে শান্ত হলো না। শান্তি নেই দরবারার মনে। তোড়জোড় করে নিজেই চরকা নিয়ে বসে গেল—কিন্তু বার বার সুতো কেটে গেল। ক্ষেতে কিষাণ

কামিনকে কাজ দেখাতে গিয়ে নিজেই মাঠে নেমে গেল লাঙল ঠেলতে। খানিক ঠেলাঠেলি করে, বলদ গুলোকে গালমন্দ মারধোর করে শেষ পর্যন্ত তুফানের পিঠে চেপে বসে ছুটিয়ে দিলে জোরে।

ছুটতে পেয়ে আজ তুফানও যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। গ্রামের এই রয়ে বসে চলার জীবন—ঢিকিয়ে ঢিকিয়ে চলায় স্বয়ং প্রভু আর তার বাহনের যেন ভালো লাগছিল না। টগ্‌বগিয়ে ছুটতে শুরু করলো তুফান।

ক্ষেত খামার পার হয়ে, বড় একটা মাঠ পার হয়ে ছুটে চলল দরবারার ঘোড়া। এক জায়গায় মাঠের পাশে এক দঙ্গল ভেড়ার পাল চরছিল, তারা ভয়ে ছড়িয়ে ছিটকে গেল, ডাকতে সুরু করে দিলে তারস্বরে।

দরবারা দেখতে পেল—সামনে বিরাট একটা পিপুল গাছের তলায় কে একজন বসে বসে ঢুলছে। কৌতূহল হল। খটাখট্ শব্দ করে দরবারার ঘোড়া এসে দাঁড়াল সেই গাছ তলায়। লোকটার ঢুলুনি তখনো চলছে। হঠাৎ ঘোড়ার পায়ের শব্দে তার আচ্ছন্নতা যেন একটু কাটল। বন্ধ চোখ দুটো হঠাৎ যেন অতি কষ্টে একটু খুলে গেল এবং বিড়বিড় করে উঠল :

'ওয়া গুরুজী কি ···।'

'আরে—কৃপাল সিং না?' দরবারা ঘোড়া থেকে নেমে বলল, 'এই সকালে গাছতলায় বসে বসে ঢুলছো?'

কৃপাল সিং প্রথমে একটু অস্বস্তি বোধ করল। পরে বলল, 'মস্ত একটা লড়াই হচ্ছিল সর্দারজী। তুমি এসে লড়াইটা থামিয়ে দিলে।'

'বটে!' দরবারা বলল, 'চোখ বুজে 'লড়াই করছিলে?'

'জরুর!' কৃপাল বলল, 'জবরদস্ত লড়াই।'

'কোথায়?'

'চিলিয়ানওয়ালায়।' কৃপাল সিং গম্ভীর গলায় বললে, 'ফিরিঙ্গী কাপ্তানটাকে প্রায় মেরে ফেলেছিলাম। এমন সময় তুমি এসে পড়লে, ব্যাটা বেঁচে গেল।'

'বটে!'

কৃপাল সিং আবার একটা হাই তুলল—বলল, 'আর কি করব বলো। সকালে এক বড়ি আফিং খাই, ভেড়াগুলোকে মাঠে ছেড়ে দিয়ে বসি এই গাছ তলায় আর সারা দিনটা লড়াই করে ফিরি। আবার সন্ধ্যেবেলা এক বড়ি আফিং—বাস, দিব্যি কেটে যায় রাতটাও। হেঁ হেঁ'—কৃপাল সিং হেসে বলল, 'লড়াই ছাড়িনি সর্দারজী, খালসা সিপাহী তো।'

'খালসা সিপাহী—খালসা সিপাহী!' গর্‌গর্ ক'রে উঠল দরবারা, 'জাহান্নমে

গেছে।' বলে লাফ দিয়ে আবার চেপে বসল ঘোড়ার পিঠে। অকারণে ঘোড়াটাকে লাগাম দিয়ে পিটোতে লাগল সপাসপ্। তুফান ছুটল তুফানের বেগে। ছুটল আবার ক্ষেতখামার মাঠপ্রান্তর পার হয়ে। এবার সোজা গাঁয়ের দিকে।

গাঁয়ে ঢোকার মুখে পেছন থেকে ডাক, 'আরে রোখো সওয়ার—রোখো।'

দরবারা লাগাম টেনে পেছন ফিরে দেখল—ধিয়ান সিং।

ধিয়ান বললে, 'এই দেখলাম—নিজেই লাঙল ঠেলতে নেমে গেছ—এই আবার ঘোড়া ছুটিয়ে চললে।'

'একটা মুশকিল কি জান'—দরবারা বলল, 'ওই বুদ্ধু বলদগুলো বড্ড আস্তে চলে। ওরা যদি ঘোড়ার মতো ছুটতো!'

ধিয়ান সিং জিভে চুকচুক্ শব্দ করে বলল, 'আহা রে খালসা সিপাহী!...' বলে নিঃসাড় মাঠপ্রান্তর চমকে দিয়ে হা হা করে হাসতে লাগল। তারপর হাসি থামিয়ে বলল, 'একটা কথা জিজ্ঞেস করতে এলাম।'

দরবারা চোখ কুঁচকে, মুখ বেঁকিয়ে বলল, 'বোধহয় তোমার জামাইয়ের কথা?'

ধিয়ান সিং কথাটা একটু ঘুরিয়ে বলল, 'হ্যাঁ—তোমার বেটার কথা।'

'কাল সন্ধ্যে বেলা সে এসেছিল।' দরবারা গর্গর্ করে বলল, 'তাকে ভাগিয়ে দিয়েছি।'

ধিয়ান সিং কেমন থতোমতো খেয়ে গেল দরবারার সাফ জবাবে। ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করলে, 'কিন্তু দেবী?'

'সে আর তোমার বেটি নয়—আমার বেটি। তার কথা আমি ভাববো।' দরবারা বলল, 'তোমাকে একটা খারাপ খবর শোনাই ধিয়ান—মহারানী ঝিন্দন ফিরিঙ্গীদের হাতে বন্দী। পঞ্জাবের কাছে শুনেছি।'

'বন্দী!'

দুই প্রবীণ খালসা সিপাহী বোবার মতো চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল কিছুক্ষণ। ধিয়ান সিং শুধু বিড বিড় করে বলল, 'দীপ সিং যে বলেছিল ...'

'ওদের বয়স কম—ফিরিঙ্গী শয়তানদের এখনো ভালো করে জানে না, আমাদের নিজেদের বিশ্বাসঘাতক বেইমানদের এখনো চেনে নি ওরা। কে জানে—তারাই হয়তো ধরিয়ে দিয়েছে।'

ধিয়ান সিং হতাশভাবে ওর মুখের দিকে চেয়ে রইল।

দরবারা একটু বিদ্রূপের হাসি হেসে বললে, 'কৃপাল সিংকে মনে পড়ে?'

'পড়ে বৈকি সে তো আমাদের সঙ্গী ছিল।' ধিয়ান বললে, 'পুরাণা খালসা।'

'হাঁ। এখনও খালসা। তবে কিনা দুবেলা ঠেসে আফিং খায় আর ঝিমিয়ে ঝিমিয়ে ফিরিঙ্গীদের সঙ্গে লড়াই করে। দেখে এলাম।'

ধিয়ান বললে, 'এ নেশায় আজ সারা পঞ্জাব ঝিমোচ্ছে দরবারা।'

'তুমিও ধরেছ নাকি ?'

'না, মানে—' ধিয়ান আমতা আমতা করতে লাগল।

দরবারা বলল, 'কাল সারারাত ভেবে ভেবে আমি একটা মতলব ঠিক করেছি ধিয়ান। শোন। ব্যবসায়ী সেজে লুধিয়ানা যাই চলো—দরকার হলে লাহোর পর্যন্ত। পুরাতন খালসাদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারলে চুনার পর্যন্ত যাবো। মহারানী সেইখানে আটক আছেন!'

'তারপর ?'

'চেষ্টা করে দেখতে হবে—ওদের ওই গারদ ফাটক ভেঙে গুঁড়িয়ে মহারানীকে বের করে আনা যায় কি না। একদিন তুমি শেষ লড়াইয়েব কথা বলেছিলে আমাকে। যাবে তুমি আমার সঙ্গে ধিয়ান ?'

'নিশ্চয়ই যাবো দরবারা।' সাগ্রহে ধিয়ান বলল, 'কবে যাবে ?'

'আজ আমি লুধিয়ানা যাচ্ছি—ওখানে ব্যবসায়ীদের সঙ্গে একটু যোগাযোগ করবো। কিছু আলোয়ান আনবো। কিছু খবরটবর যোগাড় করবো। আজই ফিরে আসবো।'

'হঠাৎ আলোয়ান কি হবে দরবারা ?'

'আমার দেবী বেটিকে দিয়ে যাবো—ও নক্সা করবে বসে বসে। শাল বানাবে। আজ একটা চরখাও এনে দিয়েছি। লুধিয়ানার বাজার থেকে কিছু ভালো তুলাও আনবো।' দরবারা বললে, 'এই সূত্রে সওদাগরদেব সঙ্গে একটু ভাবসাবও হবে। ব্যবসায়ী সাজতে হলে ওটাও চাই তো! তুমি তৈরী থাক। কালই যেতে পারি।'

পরেব দিন সন্ধ্যে বেলা দরবারা ধিয়ান সিংয়ের বাড়িতে গিয়ে খবর দিয়ে এল, 'তৈয়ার হো ধিয়ান সিং—শেষ রাতে রওয়ানা হবো লাহোর।'

বহুদিন ওরা দুজনেই লাহোর ছাড়া। অথচ জীবনের সবটাই প্রায় কেটেছে লাহোরে। সেই লাহোব-ছাড়া হয়ে ওদের মন আকুল।

যাওয়ার সময় ধিয়ান সিং কোমরে মস্ত কৃপাণ ঝুলিয়েছিল। দরবারা বলল,

'ওটা বাড়িতে রেখে যাও ধিয়ান। মনে রেখ, তুমি এখন সওদাগর। একটা ছোরা নিতে পার সঙ্গে। বাস্। ফিরিঙ্গীরা সন্দেহ করবে না।'

শেষ রাত। সবে তখন শুকতারা উঠেছে। তার মিনমিনে ভুতুড়ে আলোয় পিম্পল গাঁওর মাঠ-প্রান্তর পার হয়ে ছুটে চলল দুটো ঘোড়া।

দরবারা বলল, 'ঘোড়া দুটো কেমন ছুটছে দেখেছ?'

খালসা সিপাহীর ঘোড়া—কুচকাওয়াজ করেছে, লড়ায়ের ময়দান দেখেছে। প্রান্তর থেকে প্রান্তরে ছুটেছে। মুড্‌কি থেকে সোবরাঁও- সোবরাঁও থেকে চিলিয়ানওয়ালা, গুজারাট। গাঁয়ে বসে বসে বোধ করি ওদেরও ভাল লাগছিল না। আজ পায়ের তলায় সেই পুরাণো পাথুরে পথের ছোঁয়া পেয়ে ছুটেছে টগ্-বগিয়ে।

লুধিয়ানার বাজারে এসে ওরা থামল।

দরবারা বললে, 'সঙ্গে কিছু মাল নিতে হবে ধিয়ান।'

ধিয়ান বলল, 'কোন্ মাল।'

'এই কিছু কিছু শাল, গালিচা।' দরবারা হেসে বলল, 'ভেক না হলে ভিখ্ মিলে না দোস্ত।'

নিজের তাঁতশাল খোলার মতলব নিয়ে কিছু কিছু ব্যবসায়ীর সঙ্গে ইতিমধ্যেই আলাপ পরিচয় হয়েছিল দরবারার। ধারে তাদের কাছ থেকে কিছু ভালো শাল—দু-চার খানা গালিচা নিয়ে বোঝাই করল দুটো ঘোড়ার পিঠে। খানাপিনা করলে। তারপর চড়ে বসলো আবার ঘোড়ায়।

কিন্তু বাজারের শেষপ্রান্তে এসে ঘোড়া দুটো থমকে দাঁড়াল। সামনে অনেক মানুষের ভিড। পথের পাশে এক গাছ তলায় কারা বীণ্ বাজিয়ে গান শুরু করেছে—একটি পুরুষের গলা, একটি মেয়ের। লোক জমে গেছে ঢের। গাছতলা ছাড়িয়ে সামনের ফাঁকা জায়গা উছলে, লোকের ভিড এসে পড়েছে রাস্তায়। মন্ত্র-মুগ্ধের মতো সবাই শুনছে গুরু গোবিন্দের জাফরনামা :

পঞ্চো মেঁ নিৎ বর্তৎ মঈ হুঁ।
পঞ্চে মিলন তো পীরন্ পীর॥

[পাঁচের যেখানে মিলন—সেখানেই আমি আছি! পাঁচের মিলনেই সব কিছু হয়ে ওঠে মঙ্গলময়।]

পুরুষ গায়ক তার সুন্দর সুরেলা গলায় বিন্যাস করে বুঝিয়ে দিচ্ছে গুরুর বাণী। সুকৌশলে আবার অতীত বাণীকে তুলে ধরছে বর্তমানের দুর্দিনের পটভূমিতে।

বলছে, 'হায় ভাইয়া, কোথায় সেই আমাদের পাঁচের মিলন সভা, কোথায় সেই মঙ্গল? বেইমান বিশ্বাসঘাতকে ভরে গেল দেশ। আমাদের মাথায় চেপে বসেছে অন্যায় আর জুলুম। আমরা কত আর সইব? গুরু বলছেন :

চুঁ কার অজ হম হীলতে দরগুজস্ত্।
হলল্ অস্ত্ বাবর্দ ব সমশের দস্ত্॥

অহিংস উপায় যদি ব্যর্থ হয়,—শাণিত কৃপাণের মুখে সে অন্যায়ের বিনাশ করো।'

হঠাৎ বীণ্ বেজে উঠল রুদ্র ঝংকার দিয়ে। কেমন একটা চাপা উত্তেজনা ফেটে পড়ছে যেন শ্রোতাদের চোখেমুখে।

ধিয়ান বলল, 'লোকটাকে চেনা চেনা মনে হ'চ্ছে দরবারা।'

'বৈরাগী ফকির?'

'উহুঁ—মুড্‌কির লড়াইয়ে ছিল মনে হচ্ছে। হ্যাঁ, চিনেছি!' ধিয়ান জোর দিয়ে বললে, 'ওই দেখ, ভালো করে দেখ—ওর বাঁ হাতের একটা আঙুল কাটা না?'

'কাটা মনে হচ্ছে।'

'তবে নির্ঘাৎ ও মুড্‌কি লড়াইয়ের সেই নারায়ণ সিং। ওর গানের মানেটাই বা কি রকম মনে হচ্ছে তোমার?'

দরবারা কি যেন ভাবতে ভাবতে বলল, 'ওই গান শোনার ভিড় দেখে মনে হচ্ছে—লুধিয়ানার মানুষ সবাই মরেনি।'

ওরা দেখতে পেল—গান শেষ হওয়ার পর পয়সাকড়ি পড়তে শুরু করেছে গাইয়ে যুগলের সামনে। কিন্তু হাতজোড় করে উঠে দাঁড়িয়েছে দুজন। মাটিতে পয়সাকড়ি পড়ে রইল—ওরা ফিরেও তাকাল না। চলে যাচ্ছে দুজন।

দূরে তখন একটা হল্লা আর গর্জন শোনা যাচ্ছে : হঠাও … হঠাও …

ধিয়ান বললে, 'দেখছ ব্যাপারটা।'

'ওরা কারা?'

'বেশবাসটাও লক্ষ্য করো। কেমন যেন একটু নতুন নতুন।'

মাথায় সিধা পাগের পাগড়ি, গলায় রয়েছে মালার মতো গিট দেওয়া সাদা পশমের মোটা সুতো, কোমরে ঝুলছে ছোট একটা লোহার পরশু। এ ঠিক গতানুগতিক অতি পরিচিত খালসা ভক্তের বেশ নয়।

'হবে—অন্য কোন পন্থী হবে, লড়াইয়ে হেরে মনের দুঃখে ভক্ত ব'নে গেছে।' দরবারা নিরাসক্ত ভাবে বলল।

এমন সময় খুব একটা গোলমাল শুরু হয়ে গেল। ভিড় করা লোকজন যে যেদিকে পারল ছুটতে শুরু করে দিলে। দূরে দেখা গেল—জনা তিনেক গোরা পল্টন ঘোড়া ছুটিয়ে এই দিকে আসছে।

এসেই খোঁজ খবর শুরু করে দিলে, 'কাঁহা—সাধু কাঁহা? কিধার গিয়া?'

ত্বরিৎ বুদ্ধিতে দরবারা সিং বড় দড—চটপট উল্টো দিকে দেখিয়ে দিলে।

'তুম কৌন হ্যায়।'

'সওদাগর।'

'হটো হিঁয়াসে। হে ··· ভিড় হটাও ··· হটো শুয়ারকা বাচ্চা ··· হট্ যাও।'···

দুজন পল্টন ছুটলো সাধুর সন্ধানে। একজন ভিড় হটাতে লাগল।

দরবারা নীচু গলায় বললে, 'ব্যাপারটা অন্য রকম মনে হচ্ছে ধিয়ান। সাধুর পরিচয়টা একটু নিয়ে যাই চলো। সাধুজী ওই গলি দিয়ে গেছে।'

এদিক ওদিক অনেক ঘুরে শহরের এক প্রান্তে এসে সাধুজীর দেখা পাওয়া গেল। সঙ্গিনীটি আর নেই—সাধুজী একা বসে আছে এক গাছতলায়।

ওরা দুজন ঘোড়া দুটোকে দূরে রেখে পায়ে হেঁটে সাধুজীর কাছে হাজির হলো।

ধিয়ান সিং সোজা সাধুর সামনে গিয়ে নাম ধরেই ডাক দিল, 'নারায়ণ সিং!'

সাধু অবাক হয়ে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল ধিয়ান সিংয়ের দিকে। তারপর হাসির ছোঁয়া দেখা গেল মুখে। মৃদু কণ্ঠে বলল, 'ধিয়ান সিং।'

'ঠিক চিনেছ।' ধিয়ান বলল, 'আমিও চিনেছি তোমাকে।'

দরবারাকে দেখিয়ে নারায়ণ সিং বলল, 'সঙ্গে দেখছি দরবারা সিং।'

'খালসা সিপাহী—সোবরাঁও, চিলিয়ানওয়ালার লড়াইয়ে ছিল।' ধিয়ান বলল, 'দরবারা সিংকে চিনবে না কে?' তারপর জিজ্ঞেস করল, 'তা তোমার এখন মতলব কি? সাধুসন্ত বনে গেছ? সিপাহীগিরি ছেড়ে দিয়েছ?'

নারায়ণ সিং বলল, 'খালসা কি সিপাহীগিরি ছাড়তে পারে ভাইয়া? সে আমরণ সিপাহী।'

কথাটা দরবারার বড় ভালো লাগল। তবু ক্ষোভে দুঃখে বলে ফেললে, 'কিন্তু খালসা এখন বেইমান হয়ে গেছে ভাইয়া, তার সে চরিত্র আর নেই। ফিরিঙ্গী শয়তান তাকে বশ করে ফেলেছে।'

নারায়ণ সিং ধীর দীপ্ত কণ্ঠে বলল, 'খালসার বীর চরিত্রকে আমার গুরু আবার গড়ে তুলতে চান—যে চরিত্র কোনো শয়তানের বশ মানবে না। বহুৎ নোংরা জমে

গেছে আমাদের চরিত্রে ঠিক,—ঐক্য গেছে, পবিত্রতা গেছে। লাহোরে গেলে দেখবে, বড বড সর্দারেরা বিলাতী মদে আর বিলাসে গা ভাসিয়ে দিয়েছে। তবু—তবু মনে রেখো—কয়লাকা ভি ময়লা ছুটে যব আগ্ করে পরবেশ।'

দরবারা আগ্রহ ভরে জিজ্ঞেস করল, 'কে তোমার গুরু নারায়ণ সিং?'

'গুরু রাম সিং।' নারায়ণ সিং বলল, 'তিনিও ছিলেন মুড্কি লডাইয়ের খালসা সিপাহী। খালসার দুর্বলতা তিনি বুঝেছিলেন আগেই—তাই দূরে সরে যান।'

ধিয়ান সিং জিজ্ঞেস করল, 'কোথায় থাকেন তিনি?'

'লুধিয়ানারই মানুষ।' নারায়ণ সিং বলল, 'ভাইনী গাঁও।'

দরবারা বলল, 'আমাদের নেবেন তিনি দলে?'

'ছুৎ, অচ্ছুৎ, শিখ, মুসলমান—আমাদের দলে সবাই আসতে পারে ভাইয়া—আমরা জাত মানি না, মানুষ মানি। বডলোকদের আর বিশ্বাস নেই—বরং বুকে টেনে নিই গাঁয়ের মুচি-মাল্লা কিষাণ-মজুরদের। তাদের মধ্যে মানুষ এখনও আছে।' নারায়ণ সিং বলল, 'আমাদের দীক্ষার শর্ত শুধু তিনটি—মরতে রাজি আছ? জীবনের আকাঙ্ক্ষা ছেড়েছ? মাটির সঙ্গে মাটি হতে পারবে? যদি পার তবে এসো আমাদের সঙ্গে।'

কথাগুলো যেন সেই 'খালসা'র স্রষ্টা গুরুগোবিন্দের দীপ্ত ঘোষণার কথা মনে পড়িয়ে দেয়। মৃত্যুভয়হীন সেই সিংহবিক্রমের কথা।

দরবারা বলল, 'লাহোরে যাচ্ছি এখন—ফিরে এসে দেখা করবো।'

ইতিহাসে গুরু রাম সিংয়ের অনুগামীরা 'কুকা' বা 'নামধারী' নামে পরিচিত। নানা সম্প্রদায়ের ভেতর থেকে পঞ্জাবের সদ্যপরাধীন মানুষের দল তখন আশায় ও আশ্বাসে গুরু রাম সিংয়ের শ্বেত পতাকার নীচে নতুন উদ্যমে জমায়েৎ হয়ে উঠছে।

দরবারা ঘোড়ার পিঠে উঠতে উঠতে বলল, 'তোমার বেটা দীপ সিং একদিন বলেছিল—তাদের নেতা নেই, চরিত্র নেই। বুদ্ধি নেই, বিশ্বাস নেই। কিন্তু নারায়ণ সিংয়ের কথা শুনে মনে হচ্ছে—এবার তারা নয়া নেতা একজন পাবে।'

ধিয়ান সিং বললে, 'বুড়ো বয়সে সেইটে যেন দেখে নিশ্চিন্তে মরতে পারি দরবারা।'

দুটো ঘোড়া ছুটল আবার লাহোরের দিকে। ঝড়ের বেগে। গুরু রাম সিংয়ের খবর পেয়ে দুজনের মন নানা স্বপ্নে ও আশায় যেমন বিভোর—তেমনি মনে কাঁটার মতো বিঁধছে আরও একটা কথা: রানী ঝিন্দন ফিরিঙ্গীর কারাগারে

বন্দী। মহারাজ রণজিৎ সিংয়ের খালসা বাহিনীর সিপাহী যোদ্ধা দু'জনেই। বয়স হয়েছে আজ। অনেক লড়াই তারা লড়েছে পঞ্জাব-কেশরীর কালে—গায়ে তাদের অনেক অস্ত্রের দাগ, অনেক জয়ের কাহিনী দাগা। তাই ফিরিঙ্গীর কাছে পরাজয় এবং স্বজন-স্বজাতির বিশ্বাসঘাতকতার গ্লানির বোঝা সইতে না পেরে লজ্জায় অপমানে ঘৃণায় লাহোরের ত্রিসীমানা ছেড়ে পালিয়ে এসেছিল একদিন দূর পিম্পল গায়ে। আজ আবার ফিরে চলেছে। রানী ঝিন্দন বন্দী, এ যেন ওরা সইতে পারছিল না। মহারানী ওদের গৌরবের দিনের শেষ চিহ্ন। তাকে রক্ষা করার জন্যে ওরা প্রাণ পর্যন্ত দিতে পারে।

লাহোরের কাছে ওরা যত এগিয়ে আসছিল ততই কেমন যেন চঞ্চল হয়ে উঠছিল দুজনে। আর কেমন অস্বাভাবিক লাগছিল পথঘাট। সব যেন থম্‌থমে। রাস্তায় লোকজন প্রায় নেই বললেই হয়। অথচ পঞ্জাব-কেশরীর রাজধানীর পথ নানা ধরনের লোকজনের সমাগমে এক সময় মুখর হয়ে থাকত।

দরবারা সিং বলল, 'ফিরিঙ্গীদের হাতে লাহোর সঁপে দিয়ে সবাই কি পালিয়ে গেছে নাকি হে—না মরে গেছে?'

ধিয়ান সিংও অবস্থাটা বুঝবার চেষ্টা করছিল। কিন্তু রাস্তায় একটা লোকও নেই যে জিজ্ঞেস করে।

নগরের প্রধান প্রবেশ-পথের কাছে এসে ওরা থমকে দাঁড়াল। সূর্য তখন অস্তাচলে।

'হল্ট।' ...

দেখতে দেখতে ফটকের ওপাশ থেকে দুজন গোরা টলতে টলতে এগিয়ে এল। দুজনের হাতে পিস্তল। মুখে মদের তীব্র গন্ধ। পথ আগলে দাঁড়াল।

'কৌন হ্যায়? কাঁহা জায়েগা?'

দরবারা ঘোড়া থেকে নেমে পড়ল। বলল, 'আমরা সওদাগর।'

'আজ শহরে ঢুকিবার হুকুম নাই।' একটা গোরা বলল, 'ফিরিয়া যাও—নয়ত গুলি করিবে।'

'বহুৎ ভালো ভালো শাল ছিল সাহাব।' দরবারা বলল টোপ দিয়ে, 'বহুৎ আচ্ছা আচ্ছা গালিচা ভি ছিল। হুকুম হয় তো দেখাই।'

লোভে চক্‌চক্‌ করে উঠল এক পল্টনের চোখ—ফিস ফিস করে কি বলল সঙ্গীর কানে কানে। সঙ্গী সঙ্গে সঙ্গে একগাল হেসে ইংরেজীতে বললে, 'এমন আনন্দের সন্ধ্যাটা মাটি করবে—We are celebrating the day, উৎসব উদ্‌যাপন করিতেছি, আর এই লোকগুলো হলো বেরসিকের বাচ্চা। মদ ছোঁয়না, বীফ খায় না।'

'But—আচ্ছা আচ্ছা মাল ছিল বলিটেছে।'···

'All right. ঠিক হ্যায়।' পল্টনটা দরবারার দিকে ঘুরে বললে, 'শোনে মার্চেন্ট, আজ তিনটা রিবেল-কে আমরা ফাঁসিতে লটকাইয়াছি—বহুৎ রিবেল বন্দী হইয়াছে। আর ওই হতভাগা বিদ্রোহীরা যাহাতে ঢুকিতে না পারে—তাই শহর বন্ধ করা হইয়াছে। কিন্তু তোমরা সওদাগর বলিটেছ।'

দরবারা বলল, 'বহুৎ দূর থেকে আসছি সাহেব।' তোমাদের মন-পসন্দ, আচ্ছা আচ্ছা সব মাল ছিল।'

'তবে আইস।' পল্টন বলল. 'আজ রাতে আমাদের কাছে জিম্মা থাকিবে।'

দরবারা ঘোড়ার পিঠ থেকে মাল নামাতে নামাতে ধিয়ানকে ফিসফিস করে বলল, 'অন্ধকারে শহরের ভেতরে সটকে পড়তে পারবে তো?'

'তা পারবো।' ধিয়ান বলল, 'কিন্তু তুমি?'

দরবারা বলল, 'শোভা সিংয়ের বাড়িতে দেখা হবে। মিঠাইওয়ালা শোভ সিং—পুরানা বিশ্বাসী আদমি। আমি ঠিক সরে পড়তে পারবো। দুটো তো মাতাল! পারলে খতম করে যাবো। এখন মাল দেখাই। তুমি ঘোড়া দুটোকে সরিয়ে নিয়ো সুবিধে মত।'

ওরা ফটকের ভেতরে ঢুকলো।

ভেতরের অবস্থাটা দরবারা এক লহমায় বুঝে নিলে। সৈনিক দুটো মাত্র নয় —দেশোয়ালী সৈনিকও আছে জনা চারেক। সব কটাই নেশায় চুর। জন তিনেক বিদ্রোহী খালসাকে ফাঁসিতে লটকে এবং বেশ কিছুকে বন্দী করে ফটক-রক্ষীর দলটি উৎসব পালনে মত্ত। ইতিমধ্যেই বেশ কয়েকটা বিলাতী শূন্য বোতল মাটিতে গড়াগড়ি খাচ্ছে। দরবারার এক জাত-ভাই—মাটিতে চিৎপাত। দুজন বিহারী পুরবিয়া সৈনিক এবং একটা গুর্খা, ওরা এখনও বসে আছে—তবে বসে বসেই টলছে এবং চেঁচাচ্ছে:

'কৌন্ লিয়া পঞ্জাব!'

পুরবিয়া বিহারী দু'জন এক সঙ্গে গুর্খার দিকে ঘুসি পাকিয়ে বলল, 'চুপ রহে জংলী, পঞ্জাব জয় করেছি আমরা।'

গুর্খার সাফ কথা, 'পঞ্জাব হামি লোক লিয়া।'

এবং ধরাশায়ী পঞ্জাবীটি চোখও খুলছে না, কথাও বলছে না—তবে মরেনি, নিঃশ্বাস পড়ছে।

অবস্থা দেখে মনের ভেতর সাপের মত গর্জে উঠল দরবারা—চওড়া কঠিন পাঞ্জা দুটো নিশপিশ করে উঠল টুঁটি চেপে ধরবার জন্য। এদের সাহায্যেই ফিরিঙ্গী

দুশমন পঞ্জাব জয় করেছে! নিজেকে সংযত করে মনে মনে শুধু বললে: এই আজ তার সাধের লাহোরের রূপ!

একজন বিহারী পুরবিয়া গুর্খাটাকে গালাগাল দিয়ে উঠল, 'চুপ রহো জংলী গিধ্ধোড়কো বাচ্চা।'

হঠাৎ গুর্খাটা তার ভোজালি উঁচিয়ে ধরল।

একটা গোরা তার পিস্তল তুলে ধরল, 'হে ··· স্টপ, শুয়ারকা বাচ্চা!'

'শুয়ারকা বাচ্চারা' সঙ্গে সঙ্গে থেমে গেল।

দরবারার দিকে ফিরে একজন গোরা বলল, 'আইসো মার্চেন্ট, টোমার মাল দেখাও। আচ্ছা, আগে একটু ড্রিংক করিয়া লই। বুঝিলে, আজ সব রিবেলকে ঠাণ্ডা করা হইয়াছে। দেখ, লাহোর একদম চুপ!'

হ্যাঁ, লাহোর নীরব—নিঃসাড়। পঞ্জাবকেশরীর কলরব মুখর রাজধানী যেন মরে গেছে—শেষ হয়ে গেছে।

'এখন দেখাও তোমার মাল মার্চেন্ট।'

গোরারা সামনে চেয়ার টেনে বসল। পেছনে দেশোয়ালারা ঝিমোতে লাগল।

দরবারা দু'চারখানা শাল বের করে ফেলে দিলে সামনে।

শালগুলো হাঁটুর ওপরে রেখে ঝকমক্ ক'রে উঠল গোরাদের চোখ। নানা রঙের জমির ওপরে ঝলকে উঠল পঞ্জাবী শিল্পীর বাহারী নক্সার কাজ। তবু শালের ওপর আঙুল ঘষতে ঘষতে এক গোরা বললে, 'ইয়ে আচ্ছা নেহি। হামারা ল্যাংকাশায়ার আর ম্যাঞ্চেস্টারের মাল আরও উট্টম।'

দরবারা রাগ চেপে বললে, 'নক্সাটা দেখ সাহেব।'

'আর কি আছে দেখাও।' বলে অন্য গোরাটা কোলের শালগুলো এক পাশে সরিয়ে রাখল।

আরও খান দুই চার বাহারী শাল মেলে ধরল দরবারা।

সে কথানাও এক পাশে সরিয়ে রেখে আর এক গোরা বলল, 'আর কি আছে দেখাও।'

এবার গালিচা। দরবারা একখানা গালিচা মেলে দিলে মাটির ওপরে। আবার ঝল্‌কে উঠল গোরাদের চোখ। দরবারা মনে মনে বললে, এ চিজ তোদের চৌদ্দ পুরুষও দেখেনি সাহেব। মুখ ফুটে বললে, 'দেখিয়ে নক্সা।'

এক গোরা উঠে পড়ে চটাপট গালিচাটা গুটিয়ে এক পাশে সরিয়ে রেখে বললে, 'আর কি আছে দেখাও।'

আর একটা গালিচা মেলে দিলে দরবারা।

সেটাও আগের মতো এক পাশে সরিয়ে রেখে আবার বলল, 'আর কি আছে দেখাও।'

দরবারা বললে, 'আর তো কিছু নেই সাহেব।'

'Well !'

দুই গোরা নিজেদের ভাষায় কি বলাবলি করল—দরবারা তার এক বর্ণও বুঝল না। তবে এইটুকু বুঝল—ব্যাপার সুবিধার নয়। শুধু একটা আশার কথা—ধিয়ান সিং ইতিমধ্যে ঘোড়া দুটো নিয়ে সরে পড়েছে। এবং সন্ধ্যের অন্ধকারও ঘনঘোর হয়ে আসছে।

দরবারা বলল, 'কোন্‌টা পসন্দ্‌ হলো সাহেব? সবগুলোই নেবে কি?'

'সব।'

'বেশ তো—নাও।' দরবারা বলল, 'সব নিলে অল্প দামে ছেড়ে দেবো।'

'দাম!'—এক গোরা হা-হা করে হেসে উঠল।

আর এক গোরা বললে, 'শুনো মার্চেন্ট, আজই টোমাদের মহারানীকে শাস্তি দেওয়া হইয়াছে, তাহার সব কিছু আমাদের কোম্পানী বাজেয়াপ্ত করিয়াছে, টোমাদের কোহিনুর ভি বাজেয়াপ্ত করিয়াছি। হাঃ হাঃ হাঃ!' গোরা হাসি থামিয়ে তারপর বলল, টোমারও সব মাল আমাদের গ্রেট ব্রিটিশ জাতির নামে বাজেয়াপ্ত করিলাম। টোমার কিছু বলিবার আছে?'

লুঠেরা! ... মনে মনে গালাগাল দিয়ে দরবারা নীরবে মাথা নাড়ল। মুখ দিয়ে তার কোনো কথা বার হলো না।

গোরা বললে, 'উত্তম। তবে আইস, একটু আনন্দ করা যাক। আজ বড় শুভ দিন। থাম—আর একটু পান করিয়া লই।'

আবার খানিকটা মদ গিলে এক গোরা বললে, 'Well—তোমাদের ঘোড়া দুইটা কোথায়?'

'ফটকের কাছে ছাড়া আছে সাহেব—নিয়ে আসবো?'

দরবারা এখন সরে পড়বার জন্যে ছটফট করছে।

এক গোরা বলল, 'লইয়া আইস: উহাদেরও বাজেয়াপ্ত করিলাম।'

'ধরে আনছি সাহেব।' দরবারা যাওয়ার জন্য পা বাড়াল।

'স্টপ!' আর এক গোরার কিছুটা হুঁশ ছিল—পিস্তল উঁচিয়ে ধরল।

দরবারা থমকে দাঁড়াল। সভয়ে তাকাল গোরার পিস্তলের দিকে। ফিরিঙ্গী-দের ওই একটা বস্তুর ওপরে দরবারার যেমনি লোভ, তেমনি ভয়।

পিস্তল উঁচিয়ে গোরা তার সঙ্গীকে বললে, 'বিশ্বাস করো না, পালাতে পারে।'

ফিরে হুকুম দিলে দেশোয়ালী সৈনিকদের, 'এই শুয়ারকা বাচ্চা—উস্‌কা সাথ যাও।'

কিন্তু সব কটা 'শুয়ারকা বাচ্চা' তখন মৃত্তিকা শয্যায় প্রায় অচেতন।

দরবারা বলল, 'তোমরা একজন এসো না সাহেব—এই তো ঘোড়া চরছে, ধরে দিচ্ছি।'

এক গোরা উঠে দাঁড়াল—চলতে লাগল টলতে টলতে। হাতে পিস্তল। প্রায় পড়ে যাচ্ছিল। দরবারা ধরে ফেলল। তার হাসি পেল। শিকার অতো সহজে হাতে আসতে পারে! কিন্তু এল। গোরা শুধু বিড়বিড় করে বলল, 'টোম বহুৎ গুড মার্চেন্ট আছ।' গোরাকে ধরে ধরে নিয়ে এল ফটকের কাছ পর্যন্ত। তারপর অন্ধকারে শুধু শোনা গেল দরবারার দাঁতে চাপা একটা কথা: 'আমার তুফানকে এবার বাজেয়াপ্ত কর্ ফিরিঙ্গী শয়তান!'

চাপা গলা থেকে একটা করুণ ক্ষীণ গোঙানী বেরিয়ে এসে মিলিয়ে গেল অন্ধকারে।

তারপর আর কোনো সাড়া নেই শব্দ নেই।

খানিকক্ষণ ঝিমোতে ঝিমোতে অন্য গোরাটি জড়িত কণ্ঠে একবার শুধু হেঁকে উঠেছিল, 'হ্যালো টম্, ঘোড়া বাজেয়াপ্ত হইয়াছে কি?'

চির সৈনিক

ছোট এক পাহাড়ের ওপরে সুরক্ষিত চুনার দুর্গ। একেবারে দুর্গের গা ঘেঁষে প্রবাহিত বিস্তীর্ণ গঙ্গা। মহারানী ঝিন্দন তাঁর ১৮ জন পরিচারিকা নিয়ে ভেতরে বন্দী—ফিরিঙ্গী রক্ষীরা নিশ্চিন্ত। কিন্তু হঠাৎ একদিন তারা আবিষ্কার করলো—মহারানী নেই। আছে শুধু তার ১৮ জন পরিচর্য্যাকারিণী। রানী ফিরিঙ্গী কর্তৃপক্ষের জন্যে শুধু একটা চিঠি লিখে রেখে গেছেন :

'আমার কথা খুব সোজা— আমাকে খুব কঠিন শাস্তি দেওয়ার চেষ্টা ক'রো না। এখন দেখ -- পঞ্জাব শেষ ফয়সালা করতে পারে কি না।'

ফিরিঙ্গীদের টনক নড়ে উঠল। ছুটলো ওদের ভাড়া করা দেশী গোয়েন্দা আর সেনাবাহিনীর ঘোড়সওয়ার। কিন্তু কোথায় কে ? রানী তখন স্বাধীন রাজ্য নেপালে। কেবল তাঁর একমাত্র নাবালক সন্তান দলিপ সিং ফিরিঙ্গীদের হেপাজতে। ফিরিঙ্গীরা তার রক্ষক সেজে বসেছে। নাবালক রাজাকে ভয়ে ভয়ে সরিয়ে নিয়ে গেছে ওরা ওদের শক্ত ঘাঁটি কলকাতায়।

দুই বন্ধু দরবারা আর ধিয়ান ঘোড়ায় চেপে হাসতে হাসতে ফিরে এল একদিন পিপ্পল গাঁওয়ে।

ঘরের সামনে এসে তুফান ডাক দিল, 'চিঁ-হিঁ-হিঁ' ...

ঘরের ভেতর থেকে ছুটে এল রূপান আর দেবী।

রূপান দরজার কাছে দাঁড়িয়ে দেখছে—দেবী এসে ঘোড়ার লাগাম ধরে দাঁড়াল। তুফান দেবীর কাঁধে আরামে মাথা ঘষতে লাগল।

গাঁয়ের মাটিতে পা দিয়ে জিনের তলা থেকে দরবারা বার করল একটা পিস্তল।

ধিয়ান বলল, 'এটা আবার কোথায় পেলে?'

দরবারা হেসে বলল, 'আমার লাহোরের সওদা। তবে শাল আর গালিচাগুলো গেছে। ফিরিঙ্গীগুলো শয়তান সন্দেহ নেই—তবে ওদের এই জিনিসটা খুব ভালো। দিব্যি লুকিয়ে নিয়ে চলাফেরা করতে পারা যায়। যা দিনকাল। বেইমান বিশ্বাসঘাতকে দেশ ভরে গেছে।' বলে ফোঁস করে একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলল।

লাহোরের এবারকার ছবিটা ভুলতে পারে না দরবারা—সেই মাতাল দেশোয়ালী সৈন্য ক'টিকে আর সেই তাদের মত্ত আস্ফালন: পঞ্জাব কৌন লিয়া! অথচ এমন একদিন ছিল যখন রণজিৎ সিংহের রাজত্বে ওরা সবাই ছিল 'সাথী, বন্ধু, ভাই'। ভুলতে পারে না—মিঠাইওয়ালা শোভা সিংহের একটার পর একটা কাহিনী, কেমন করে বিদ্রোহ অভ্যুত্থানের পরিকল্পনাগুলো তারই জাতভাইরা টাকা ও পদমর্যাদার লোভে একে একে ফিরিঙ্গীদের কাছে ফাঁস করে দিয়েছে। ব্যর্থ হয়ে গেছে মুকেরিয়ান, ফিরোজপুর, জম্মু, পেশোয়ারের অভ্যুত্থান, ব্যর্থ হয়ে গেছে হেনরি লরেন্স এবং বেইমান তেজ সিংকে হত্যার পরিকল্পনা। উল্টে প্রাণ দিয়েছে বহু সাচ্চা খালসা, ফাঁসিতে ঝুলেছে গঙ্গারাম ও প্রাক্তন খালসা সেনাপতি কাহন সিংয়ের মতো মানুষ। কতগুলো ছেঁড়া কাগজের টুকরোর মতো ছিন্নভিন্ন পঞ্চনদের দেশ দুর্দিনের দমকা হাওয়ায় উড়ছে যেন দরবারা সিংয়ের চোখের সামনে। তার মধ্যে একটা বিশ্রী ঘায়ের মতো জেগে ওঠে নিজের ছেলের মুখ—পঞ্জাব সিংয়ের মুখ। এবার লাহোরে গিয়ে খবর পেয়েছে—সে তার নিজের ধর্ম ত্যাগ করে নাকি ক্রিশ্চান পর্যন্ত হয়ে গেছে। ক্ষোভে, ক্রোধে, অসহ্য একটা যন্ত্রণায় ছটফট করে দরবারা।

তবু এরই মধ্যে রানী ঝিন্দনের মুক্তিলাভের জন্য দরবারা সিং মস্ত একটা ভোজ দিয়ে দিল গ্রামে ফিরেই। আশ-পাশের গ্রাম থেকেও কিছু কিছু পুরানো খালসা নিমন্ত্রিত হয়ে এলো। বেশ কদিন কাটল উত্তেজনায়। তারপর আবার ফিরে এল সেই ছটফটানি। রাত নেই বিরাত নেই—তুফানের পিঠে চেপে ছুটে বেড়ায় দরবারা গ্রামের প্রান্ত থেকে প্রান্তে।

এমন দিনে মনে পড়ল লুধিয়ানার সেই নারায়ণ সিংয়ের কথা—গুরু রাম সিংয়ের অনুগামী বিহঙ্গম-চারণ নারায়ণ সিং। একদিন ধিয়ান সিংকে গিয়ে দরবারা

বলল, 'চলো ধিয়ান—ভাইনীর সেই গুরু রাম সিংকে দেখে আসি। কি ওদের ব্যাপার-ট্যাপার স্বচক্ষে দেখি একবার চলো।'

ভাইনী গাম লুধিয়ানা শহর থেকে মাত্র ষোল মাইল। দরবারা আর ধিয়ান একদিন ঘোড়া ছুটিয়ে দিলে ভাইনীর দিকে।

সামনে মাঘী মেলা। গুরু রাম সিংয়ের আশ্রমকে ঘিরে মেলা বসে মস্ত বড়। অনেক লোকজনের সমাগম হয়। দূর দূরান্তর থেকে ছুটে আসে গুরুর অনুগামীরা—তাদের মধ্যে সমাজের নীচের তলার মানুষই বেশী। আর আছে প্রাক্তন খালসা বাহিনীর সিপাহীরা। দরবারা এবং ধিয়ান যখন গিয়ে পৌছল তখন মেলার মানুষজন সবে আসতে শুরু করেছে। এরই মধ্যে প্রায় শ'পাচেক লোক জড়ো হয়ে গেছে।

নারায়ণ সিংই ওদের দেখতে পেয়ে গেল—খুশী হয়ে বলল, 'এসে গেছ তোমরা।'

দরবারা বলল, 'দেখতে এলাম—দেখাও সব।'

'কি দেখাব বলো।' নারায়ণ সিং বলল, 'আগে গুরুকে, না, তাঁর কাজ কর্মকে?'

'আগে দেখবো তাঁর কাজকর্ম।' দরবারা সাফ বলে দিল. 'সে সব দেখে মনে ধরলে গুরু দর্শন করবো।'

নারায়ণ সিং দেখাতে নিয়ে চলল।

গুরু সন্ন্যাসী নন—গৃহী এবং মহৎ গৃহস্থ। তাঁর নিজের সংসার আছে—তার সঙ্গে জুড়ে আছে অনাথ পতিতের মস্ত বড় একটা সংসার। সে গৃহস্থের রান্নাঘর নয়—গ্রামের লঙ্গরখানা. কেউ সেখানে কোনো দিন বিমুখ হয়ে ফেরে না।

দরবারা জিজ্ঞেস করল, 'গুরু ধনপতি?'

নারায়ণ বলল, 'না।'

'তবে এত জোগায় কে?'

'তাঁর অনুগামীদের মধ্যে সম্পদশালীর অভাব নেই। দরিদ্রের, ক্ষুধার্তের অন্নদান সেবা আমাদের ধর্ম। তবে নিষ্কর্মা এখানে কেউ নেই। এসো এদিকে দেখবে।'

নারায়ণ সিংয়ের সঙ্গে এগিয়ে গিয়ে আর এক জায়গায় থমকে দাঁড়াল দরবারা আর ধিয়ান। ওখানে জন পঞ্চাশেক মেয়ে বসে বসে সুতো কাটছে, কেউ বা শালের ওপর নক্সার কাজ করছে এক মনে। রান্নাঘরেও ব্যস্ত অনেক মেয়ে।

দরবারা শুধোলে, 'এরা কারা?'

নারায়ণ বলল, 'এদের মধ্যে বিধবা আছে, যবনী আছে, কুমারী আছে। লড়াইতে মরে যাওয়া অনেক খালসার বিধবারা আছে, মা আছে, বেটি আছে।'

'সবাই এখানে থাকে?'

'কেউ কেউ এখানে থাকে। কেউ বা বাড়িতে থাকে—এখানে এসে কাজ করে।'

'তুমি এখানে থাক?'

'আমি বিহঙ্গম—চারণ। কোনো এক জায়গায় থাকি না ভাই।'

'গান করে বেড়াও?'

'গুরুর নির্দেশ মতো সত্যকে প্রচার করি। তুমি তো জান দরবারা—আজ পঞ্জাবের বড় দুর্দিন।' নারায়ণ বললো, 'চলো ওদিকে দেখবে।'

মস্ত গোয়াল, একপাশে অনেকগুলি ভালো জাতের তেজী ঘোড়া, আর এক-দিকে কতকগুলো উট, গরু। একধারে কৃষিজাত পণ্যের খামার। সব জায়গায় কাজের মানুষ। সর্বত্র পরিচ্ছন্ন ছিমছাম সুশৃঙ্খল। দেখে দেখে দরবারা এবং খিয়ান মুগ্ধ হলো।

নারায়ণ বলল, 'আরও একটা ব্যাপার আছে, সে আমাদের ডাক বিভাগ। সেটা চোখে দেখা যায় না—তবে সবত্র আছে, দিল্লী থেকে আফগানিস্তান পর্যন্ত। ফিরিঙ্গীর ডাক বিভাগ আমরা ব্যবহার করি না, বিশ্বাসও করি না।'

'কেন?'

'শত্রু সহজেই আমাদের খবর জেনে যেতে পারে—তাই।'

দরবারা কিছুক্ষণ গুম্ মেরে দাঁড়িয়ে রইল।

নারায়ণ হেসে বলল, 'কি ভাই খালসা, এবার আমার গুরুকে দেখার সাধ হয়?'

দরবারা বলল, 'মনে পড়ে—একদিন লুধিয়ানা শহরের সেই এক গাছতলায় বসে তুমি বলেছিলে—কয়লারও ময়লা ছাড়ে যখন তাতে আগুনের পরশ লাগে। সে মানুষ সব কোথায়?'

নারায়ণ হেসে বলল, 'এত মানুষ দেখলে—তবু তোমার পছন্দ হলো না! ভাই দরবারা, জলার সময় হলেই দেখবে—আগুন ঠিক জলবে। তার আগে চরিত্র চাই। বারুদ তৈরী হওয়া চাই। ভেজা বারুদে আগুন ধরে না ভাইয়া। দেখছ না পঞ্জাবের অবস্থা। কতজনে কতবার আগুন জ্বালাতে চাইছে—জ্বলছে কি? আমার গুরু আগে বারুদ তৈরী করতে চান। তিনি মুড়্কি যুদ্ধে ঠেকে শিখেছেন।'

দরবারা বলল, 'চল গুরু দর্শন করি।'

ওরা একটা ঘরের সামনে গিয়ে দাঁড়াল। দরজা খোলা।

নারায়ণ বললে, 'গুরুদেব ভেতরে আছেন—যাও, কথা বলো।'

ওরা একটু ইতস্তত করছিল, নারায়ণ একটু হেসে বলল, 'যাও—ভয় নেই, খেয়ে ফেলবেন না।'

'তুমি চল সঙ্গে, একটু চেনা পরিচয় করিয়ে দাও।'

'পুরানো খালসা তোমরা—তোমাদের তিনি দেখলেই চিনবেন।' নারায়ণ বলল, 'তোমার ছেলে পঞ্জাবকে তিনি চেনেন।'

মুহূর্তে দরবারার মুখ যেন কালো হয়ে গেল। ইচ্ছে হল—তখুনি সেখান থেকে ছুটে পালায়: হায়, তার বেইমান ছেলের পরিচয় এরা সবাই জানে!

ধিয়ান সিং তার হাত ধরে ঘরে ঢুকলো। নারায়ণ সিং তার কাজে চলে গেল।

ঘোড়ায় চেপে অনেক দূর থেকে নতুন একটা দল এল— সাদা ঝাণ্ডা উড়িয়ে। সকলের সেই একই রকম বেশবাস। মাথায় সেই সিধা পাগের পাগড়ি, গলায় গিঁট দেওয়া সাদা পশমের মোটা সুতো, কোমরবন্ধে ঝুলছে একটা করে ছোট পরশু বা টাঙি। গুরু রাম সিংয়ের জয়ধ্বনি দিয়ে তারা ঘোড়া থেকে নামল।

নারায়ণ সিংকে সামনে পেয়ে সকলে তাকে জড়িয়ে ধরল।

নারায়ণ সিং তাদের থাকা খাওয়া, পরিচর্যা নিয়ে যখন ব্যস্ত—তখন এদিক ওদিক পাতি পাতি করে তাকে খুঁজছে দরবারা আর ধিয়ান। হঠাৎ দেখতে পেয়ে ছুটতে ছুটতে এল দরবারা—পেছনে ধিয়ান। নারায়ণের একটা হাত চেপে ধরে দরবারা বললে, 'নারায়ণ সিং—আমি এইখানে থেকে যেতে চাই, আর ফিরবো না।'

নারায়ণ সিং হেসে ফেলল। গুরুর সঙ্গে প্রথম দেখার পর সাচ্চা খালসারা এমনি পাগলামিই করে। নারায়ণ বলল, 'তোমার জমিজিরেত, তোমার সংসার?'

'জমিন সব বেচে দেবো।' দরবারা বলল, 'আমার একটা হতভাগী বেটি আছে, আর বৌ। তাদের আশ্রয় দাও। অবশ্য তারা কাজ করে খাবে।'

'গুরুদেবকে বলেছ?'

'তুমি বলে ব্যবস্থা করে দাও।'

'গুরুদেব হয়তো তোমার মতো লোককে এখানে থাকতে দেবেন না।' নারায়ণ বললে, 'আচ্ছা, গুরুর সঙ্গে সময় মতো আমি কথা বলবো।'

'না, এখুনি বল—আমি নিশ্চিন্ত হই।'

দরবারা সিংয়ের যে কথা—সেই কাজ। উগ্র মেজাজের মানুষ। মনে যা একবার ধরে—তক্ষুনি তাই করা চাই!

নারায়ণ হেসে গুরুর ঘরে ঢুকলো—খানিকবাদে বেরিয়েও এলো হাসতে হাসতে।

দরবারা এগিয়ে গেল—সাগ্রহে জিজ্ঞেস করল, 'কি—আমার আর্জি মঞ্জুর?'

নারায়ণ বলল, 'না-মঞ্জুর। তোমাকে তোমার গাঁয়েই ফিরে যেতে হবে ভাই দরবারা। সেইখানে থেকেই তোমাকে কাজ করতে হবে। পুরানো খালসা তুমি – দেশের অনেক জ্বালায় জ্বলেছ। সেই জ্বালা গিয়ে ছড়িয়ে দাও তোমার আশ-পাশে। গুরুর এই আদেশ। আগামী লহরী উৎসবে গুরুর দীক্ষা নিতে চাও—নিও।'

এই আদেশ মাথায় নিয়ে পরের দিন ফিরে এল দরবারা। সঙ্গে চিরঅনুগামী বন্ধু ধিয়ান সিং।

দরবারা ধিয়ানকে বললে, 'আমাকে একটু সাহায্য কর ধিয়ান।'

'বল, কি করতে হবে।'

'লুধিয়ানার কাশ্মীরী শালের কারিগরদের সঙ্গে আমার ভাব-সাব হয়েছে, তুলোর আড়ৎদারের সঙ্গেও। আমি তাঁতশাল বসাব—কারখানা বসাব। আলোয়ান বুনবো—আমার বেটি নক্সা করবে।'

'ক্ষেতি? জমিন?'

'ও আমার ভালো লাগে না। বেচে দেবো।'

ধিয়ান বলল, 'তাহলে তোমার হাত কেটে দেবো। যা করতে হয় করো—জমিন বেচা চলবে না।'

কিন্তু দরবারার মাথায় যেটা একবার ঢোকে, তাকে রুখবে কে? গোপনে বেশ খানিকটা জমি বেচে দিয়ে সে শুধু সূতী আর পশমের তাঁত নয়—গালিচার তাঁতও বসিয়ে দিলে। ডেকে আনল কারিগর, গাঁ ঢুঁড়ে জুটিয়ে আনল যত চিম্-সেমারা ভূখা বেকার তাঁতী। তুফানের পিঠে চাপিয়ে পাহাড়ীদের কাছ থেকে কিনে আনল পশম। একটা রীতিমতো কারখানা।

ধিয়ান বলল, 'ব্যাপার কী দরবারা— এ যে মস্ত একটা কাণ্ড!'

'সব বানাবো।'

'ওদিকে লুধিয়ানার বাজার যে ছেয়ে গেল ম্যাঞ্চেস্টার আর ল্যাংকাশায়ারের মালে!'

'তাকে রুখবো।' দরবারা বলল, 'সবাইকে বলবো—ওই ফিরিঙ্গীর জিনিস কেউ ছুঁয়ো না। গুরু রাম সিংয়ের কাছে কুকা হওয়ার দীক্ষা নাও। নিজের জিনিস নিজে কর, নিজে পরো। এ ব্যাপারে আমাকে সাহায্য করো ধিয়ান।'

'করবো বই কি দরবারা। তোমার মতো আমার মনের জোর নেই ভাই—তাই তোমার পেছনে পেছনে ঘুরি, তোমার আগুনে আগুন পোয়াই।' ধিয়ান সিং বলল, 'আর একটা জিনিস লক্ষ্য করেছ দরবারা?'

'কি?'

'ওই ফিরিঙ্গীগুলোর গির্জা। দেখতে দেখতে এই ক'বছরে কতগুলো গির্জা তৈরী হয়ে গেল শুধু লুধিয়ানায়! গরীব দুঃখীদের লোভ দেখিয়ে ওরা অনেককে শুনেছি খিরিশ্চান করে ফেলেছে।'

'গুরু রাম সিং ঠিকই বুঝেছেন ধিয়ান সিং।' দরবারা বলল, 'ওরা আমাদের সব কেড়ে নিতে চায়—দেশ, ধর্ম, রুজি, বীর্য—সব।'

কথাটা মিথ্যা নয়। ইংরেজের এই সর্বগ্রাসী অভিপ্রায় ইতিহাস লিপিবদ্ধ করে রেখেছে। পুরাপুরি সৈনিকের এই জাতটাকে যেমন করে হোক—কাবু করতেই হবে।

এই সময়ের বড়লাট, লর্ড ডালহাউসী লিখছেন: আমার সামনে কর্তব্য হলো—শিখ শক্তিকে সম্পূর্ণ ধ্বংস ও ধরাশায়ী করা, পদানত করা এবং গোটা শিখ-জাতটাকে অধীনতাপাশে বদ্ধ করা।

কিন্তু গুরু রাম সিংয়ের কুকা সম্প্রদায়ের ওপর ফিরিঙ্গী শাসকের চোখ তখনো পড়েনি। তাদের অলক্ষ্যে গুরুকে ঘিরে পঞ্জাবের বিক্ষুব্ধ খালসা সিপাহীরা, হতাশ শিখেরা আবার সংঘবদ্ধ হয়ে উঠছে।

তাই নিয়ে মেতে উঠল দরবারা—সঙ্গে টেনে নিয়ে চলল আবাল্য বন্ধু ধিয়ান সিংকে। এমনি একজন নয়, দু'জন নয়—হাজার জন, এক গ্রাম নয়—হাজার হাজার গ্রামে 'কুকা'র দল বাড়তে লাগল। সমস্ত শ্রেণীর মানুষের মধ্যে সম্প্রসারিত হয়ে চললো 'কুকা' সংগঠন মাসের পর মাস, বছরের পর বছর। তাদের বুকের কথা: মোটা পরবো, মোটা খাবো, ধর্ম দেবো না—প্রাণ দেবো, দেশের জন্যে জান দেবো।

এমন দিনে হঠাৎ একদিন ঝড় উঠল পুবে—বাংলায়। ঝড় উঠল খাস দিল্লীতে—মীরাটে। ১৮৫৭ সাল। দেশোয়ালী সিপাহীর বিদ্রোহ। তার ঝাপটা লাগলো ভারতের পশ্চিম প্রান্তের দেশ পঞ্জাবে—পাঁচ নদীর পারে পারে।

দরবারা চঞ্চল।

ছুটে এল ধিয়ান সিং। বলল, 'কি ভাবছ দরবারা?'

দরবারা বলল, 'পঞ্জাব কি জাগবে?'

'তোমার সন্দেহ হয় ?'

সন্দেহ হবে বৈকি দরবারার। মনে পড়ে আবার সেই লাহোর ফটকের কাছে চারটে মাতাল দেশোয়ালী সৈনিককে আর তাদের সেই কথা : পঞ্জাব কৌন লিয়া ? ফিরিঙ্গীর মদে মাতাল হয়ে গেছে—বিভ্রান্তি এসেছে সেনাদের মধ্যে। আজ পুরবিয়ার বিদ্রোহে কে যোগ দেবে আর কে দেবে না, ঠিক কী !

শিখের বিরুদ্ধে কৌশলী ইংরেজ একদিন খাড়া করেছিল পুরবিয়া আর গুর্খা সেনাকে—শিখ ছিল গুমরে। আজ সুযোগ বুঝে সেই শিখদের দিলে বিদ্রোহী পুরবিয়াদের পেছনে লেলিয়ে। চারনদীর তীর থেকে হটে হটে এল বিদ্রোহীরা—শেষ নদী শতদ্রু। চার নদীর জল গড়িয়ে গড়িয়ে ফুঁসে উঠল শতদ্রু—বিদ্রোহীরা তাড়া খেয়ে হটে আসছে লুধিয়ানার দিকে।

এমন দিনে এক সন্ধ্যেবেলায় দরবারা এসে হাজির ধিয়ান সিংয়ের বাড়ীতে। বলল, 'কাল আমি পশম আনতে যাচ্ছি ধিয়ান—তুমি আমার তাঁতশালের দিকে একটু লক্ষ্য রেখো !'

'এমন দিনে তুমি যাবে ওই দিকে !'

দরবারা বললে, 'আমি যাবো পাহাড়ীদের গাঁয়ে। ওদিকে কিছু নেই।'

ধিয়ান বলল, 'চলো না—আমিও যাই সঙ্গে।'

'উঁহুঁ।' দরবারা বললে, 'কোথায় কি হবে—দুই বুড়ো মরে যাবো এক সঙ্গে। দেবী বেটিকে তখন দেখবে কে ! ভয় নেই—একদিন পরেই আমি ফিরে আসবো পশম নিয়ে।'

শেষরাতে ঘোড়া ছুটিয়ে চলে গেল একবোখা দরবারা—কোমরে পিস্তল ঝোলানো।

গর্জে উঠেছে তখন শতদ্রুর দুই তীর। বিদ্রোহী সিপাহীর বিরাট এক বাহিনী নৌকো করে শতদ্রু পার হওয়ার চেষ্টা করল। ইংরেজ বাহিনীর নায়ক উইলিয়ামস কামান আর রাইফেল বাহিনী নিয়ে এগিয়ে গেল সদর্পে—নদীতেই শেষ করে দেবে বিদ্রোহীদের। গর্জে উঠল ইংরেজের কামান বিদ্রোহী সিপাহীদের খেয়া নৌকো লক্ষ্য করে। পর পর কয়েকটা নৌকো উল্টে গেল—বিদ্রোহীরা লাফিয়ে পড়ল নদীতে। নৌকো ছেড়ে সাঁতার কেটে এগিয়ে আসতে লাগল পূর্বতীরের দিকে। তাদের লক্ষ্য করে সমানে ছুটতে লাগল কামানের গোলা—রাইফেলের গুলি। নদীতেই ভেসে গেল অনেক মৃতদেহ। তবু ঝাঁকে ঝাঁকে—দলে দলে সাঁতার দিয়ে পার হয়ে এল শতদ্রু। তাদের কামান নেই—আছে শুধু তরোয়াল আর বন্দুক। তাই নিয়ে আক্রমণ করল তারা ইংরেজ বাহিনীকে। হঠাৎ এক বিদ্রোহীর গুলিতে নিহত

হল বাহিনীর নেতা উইলিয়ামস। তার সঙ্গে আরও কিছু ফিরিঙ্গী সৈনিক ধরাশায়ী হলো। ওদিকে শতদ্রু সাঁতার দিয়ে তখন কাতারে কাতারে পার হয়ে আসছে বিদ্রোহীর দল—দলে ভারী হয়ে উঠছে ক্রমশ। ইংরেজবাহিনী পিছু হটলো। পিছু হটলো তার গোলন্দাজ বাহিনী।

কিন্তু পেছিয়েও বুঝি ওদের আর নিস্তার নেই। বিদ্রোহীদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে সহসা জেগে উঠল লুধিয়ানা শহরের মানুষ—শিখ-মুসলমান, শাল-আলোয়ান-গালিচা কারখানার শ্রমিকের দল। দু'দিকের চাপে ইংরাজ বাহিনী প্রাণভয়ে ছুটে পালাল—কেউ কেউ ঝাঁপিয়ে পড়ল শতদ্রুর জলে। বিদ্রোহীরা সেই জলেই তাদের গলা টিপে ধরল। গ্রামে যারা পালিয়ে বাঁচতে চাইল—গ্রামের মানুষ তাদের শেষ করে দিলে। শহরে যারা ছুটেছিল আশ্রয়ের আশায়—তাদের তাড়া করল শহরের শিখ পঞ্জাবী মুসলমান।

হঠাৎ যেন ঘুম ভেঙে জেগে উঠেছে লুধিয়ানা। পুরবিয়া সৈনিকদের সঙ্গে পঞ্জাবের লুধিয়ানার আজ বিরোধ নেই। শহরে বিজয় গর্বে প্রবেশ করল বিদ্রোহীরা। চারদিক থেকে তাদের দিকে এগিয়ে এল সহযোগিতার হাত।

বিদ্রোহী সিপাহীরা ইংরেজের ধনাগার দখল করে নিলে, খুলে দিল জেলখানা, লুঠ হয়ে গেল সরকারী অফিস, গুদাম, অফিসারদের বাংলো—ভেঙে গুঁড়ো হয়ে গেল ডাকঘর, ফাঁড়ি। লুধিয়ানার কাশ্মীরী শালের কর্মীরা লুঠ করে নিলে গভর্নমেণ্ট স্টোর্স, আগুন ধরিয়ে দিলে গির্জায় গির্জায়। এতদিন ফিরিঙ্গীদের সঙ্গে সহযোগিতা করেছে যারা—তাদের বাড়িঘর দেখিয়ে দিলে বিদ্রোহীদের।

লুধিয়ানা একটা দিনের জন্য শৃঙ্খল-মুক্ত।

বিদ্রোহীদের একটা দল শুধু আটকে গেছে শতদ্রুর ওপারে—পথ ভুল করে গিয়ে পড়েছে অন্য জায়গায়। ওদের জন্যে এপারে ওৎ পেতে আছে ইংরেজের কামান বন্দুক।

ছুটেছে দরবারার ঘোড়া পথ-ভ্রান্ত বিদ্রোহী সিপাহীদের লক্ষ্য করে।

দূর থেকে দরবারা দেখতে পেল বিদ্রোহীরা জলে নামছে।

দরবারা হাঁক পেড়ে উঠল, 'ঠারো ··· ঠারো হো সিপাহী।'

বিদ্রোহীরা পিছন ফিরে তাকালো।

দরবারা ঘোড়া ছুটিয়ে কাছে এল। বলল, 'এখানে পার হওয়ার চেষ্টা করো না। ওপারে ফিরিঙ্গীদের কামান তাক করে আছে।'

বিদ্রোহী সিপাহীরা একবার দরবারার আপাদমস্তক দেখে নিল। তারপর বলল, 'তুমি শিখ?'

'হাঁ।'

'তোমার কথায় বিশ্বাস কি? তোমরা তো আমাদের শত্রুতা করছো।'

দরবারার চোখে আবার ভেসে ওঠে লাহোরের সেই মাতাল সৈনিকদের ছবি। হায়, আজ কেউ কারুকে বিশ্বাস করে না! দরবারা একটু করুণ হেসে বলল, 'বুঢ্‌ঢার কথায় বিশ্বাস হচ্ছে না বেটা। আমার কথা শোনো—এখানে পার হয়ো না, মারা পড়বে।'

বিদ্রোহী সিপাহীরা গোঁ ধরে বলল, 'তোমার কথা বিশ্বাস করিনা। আমরা এইখানেই পার হবো। মাঝখানে একটা দ্বীপ আছে। দরকার হলে ওইখানে গিয়ে আশ্রয় নেবো। আজ সন্ধ্যেও হয়ে আসছে। কাল সকালে পার হয়ে আমরা ওপারে চলে যাবো।'

'ভগবান তোমাদের রক্ষা করুন।'

বিদ্রোহী সিপাহীরা জলে নামল। সঙ্গে ওদের কোনো অস্ত্রশস্ত্র নেই। ওরা দ্বীপ লক্ষ্য করে সাঁতার কাটতে লাগল।

একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে দরবারা ঘোড়া থেকে নামল। পিস্তলটা কোমর থেকে খুলে মাথার পাগড়ির মধ্যে রাখল। তুফানের মুখে মাথায় হাত বুলিয়ে আদর করে বলল, 'ডরো মৎ বেটা। তু সিপাহী কা ঘোড়া। লড়াইয়ের ময়দান থেকে আর যেন আমাকে নিয়ে পালাসনি।'

দরবারা আস্তে আস্তে ঘোড়াটাকে নামিয়ে দিলে নদীতে। তারপর নিজে সাঁতার কাটতে কাটতে এগিয়ে চলল বিদ্রোহীদের পেছনে।

একজন বিদ্রোহী পিছন ফিরে তাকে দেখে বলল, 'এখানে যদি বিপদ তো তুমি আসছ কেন বুঢ্‌ঢা?'

'যদি কাল সকাল পর্যন্ত বাঁচ তো তোমাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবো আমাদের লুধিয়ানায়। সেখানে গিয়ে দেখো—লুধিয়ানার ভাইরা আছে তোমাদেরই সঙ্গে।'

নদীর মাঝখানে ছোট একটা দ্বীপ। লম্বায় শ'দুই গজ হবে, চওড়ায় বড় জোর সোত্তর গজ। দ্বীপে কোনো গাছগাছালি নেই। দ্বীপের কাছাকাছি হতে না হতে ওপার থেকে এসে পড়ল বুলেটের ঝাঁক। দল বেঁধে সাঁতার দিচ্ছিল বিদ্রোহীরা। বুলেটের ঝাঁকে ছিন্ন ভিন্ন হয়ে গেল। দরবারা দেখছে—জলের তলায় তলিয়ে যাচ্ছে দলকে দল। এমনি করে চোখের সামনে তলিয়ে গেল প্রায় দু'শ জন। প্রায় ২৮২ জনের মতো বিদ্রোহী উঠতে পারল দ্বীপে।

কিন্তু দ্বীপে উঠেও রেহাই পেল না কেউ। ডেপুটি কমিশনার কুপার তাঁর

নৌকো বাহিনী নিয়ে ঘিরে ফেলল ছোট দ্বীপটুকু। এ অবস্থায় অসহায় আত্মসমর্পণ ছাড়া আর পথ নেই। পাগড়িটা মাথার ওপরে ভালোভাবে চেপে বসিয়ে নিয়ে দরবারাও আত্মসমর্পণের জন্য তৈরী হল!

কুপার তার মিলিটারী পুলিসের সাহায্যে সকলকে বেঁধে নৌকোয় চালান করে দিলে।

এবার চোখ পড়ল ঘোড়াটার দিকে।

কুপার বললে, 'ভালো জাতের ঘোড়া। ওটাকেও নৌকোয় তুলে নাও।'

তুফানও উঠল নৌকোয়।

ওপারে নিয়ে গিয়ে বন্দীদের সেদিন কুঠিবাড়ির একটা ঘরে আটকে রাখা হলো। তুফান জিম্মায় রইল কুঠিবাড়ির পাশে। আশ্চর্যভাবে শান্ত হয়ে গেছে সে। প্রভুর মতই সহসা গম্ভীর ধীর স্থির।

সকালে শুরু হলো বিচার।

বিচারক কুপার বলল, 'সকলের মৃত্যুদণ্ড।'

ঘরের ভেতর থেকে এক-এক জনকে এনে দাঁড় করিয়ে দেওয়া হচ্ছে রাইফেলের সামনে। একটি আওয়াজ। একটি মৃত্যু। এমনি ভাবে ১৫০ জন খতম হয়ে গেল। যে লোকটা গুলি করছিল সে মাথা ঘুরে টলে পড়ল। কিছুক্ষণের জন্য গুলি বন্ধ রইল।

তুফান চরছে কুঠির মাঠে—কাছেই।

দরজার সামান্য ফাঁক দিয়ে দেখতে পেল দরবারা। বেচারী তুফান! সারা রাত কেউ তাকে খেতে দেয়নি। কেউ তার জিন খুলে নেয়নি। চরে চরে মাঠের ঘাস খাচ্ছে একলা। দরবারা হঠাৎ ডাক দিয়ে উঠল, 'তুফান!' তারপর তালুতে জিভের টোক্কর দিয়ে এক ধরনের শব্দ করল।

ফিরিঙ্গী প্রহরী ধমকে উঠল, 'চিল্লাও মাৎ উল্লু।'

ভেতরের আওয়াজ থামল বটে কিন্তু পরিচিত ডাক শুনে তুফান কান খাড়া করে ডেকে উঠল: 'চিঁ হিঁ হিঁ হিঁ...'; তারপর ঘনিয়ে এল বন্দীদের ঘরের কাছে।

গুলি করতে করতে যে ফিরিঙ্গীটা মাথা ঘুরে অজ্ঞান হয়ে গেছে খানিক বাদে সে চোখ পিট্ পিট্ করে তাকাল।

কুপার বলল, 'তুমি আর পারবে?'

লোকটা মাথা নেড়ে বলল, 'যিশুর দোহাই, আমাকে রেহাই দাও।'

কুপার আর একজন গোরাকে বেছে নিয়ে দাঁড় করিয়ে দিলে তার জায়গায়।

কুপার জানে—লোকটা আগে কশাইয়ের কাজ করত। হুকুম দিল, 'বন্ডী আনো।'

সুযোগের অপেক্ষায় ছিল দরবারা—পাগড়ির ভেতর থেকে পিস্তল বের করে দাঁড়িয়ে রইল তফাতে। অপেক্ষা করতে লাগল তার পালার জন্য। গুণছে ··· ১৫১, দেখতে দেখতে ১৬০ হলো, তারপর ১৮০······২০০·······২৩৭······। অধীর হয়ে উঠেছে সে। ঘরে বাকী লোকগুলো ভয়ে অজ্ঞান হয়ে গেছে। এবার তার পালা এল।

দরজার দিকে এগোল দরবারা। ফিরিঙ্গী দ্বাররক্ষী এক হাতে তার ঘাড় ধরল। যেন বলির পাঁঠা। দরজার বাইরে এবার।··· সঙ্গে সঙ্গে দরবারার পিস্তল গর্জে উঠল। ফিরিঙ্গী লুটিয়ে পড়েছে।

এক লহমায় একটা কাণ্ড ঘটে গেল। পাশেই দাঁড়িয়ে ছিল তুফান, একলাফ দিয়ে উঠে পড়ল পিঠে। পেছন ফিরে কুপারকে লক্ষ্য করে কয়েকটা গুলি ছুঁড়ে ছুটিয়ে দিলে ঘোড়া!

'পাক্‌ড়ো! ফায়ার··ফায়ার! ···'

বিদ্যুৎগতিতে রাইফেলের পাল্লার বাইরে চলে গেল দরবারা সিং। কুপারের হুকুমে ফিরিঙ্গী সেনারা ছুটলো তাদের আস্তাবলের দিকে ঘোড়ার জন্যে।

কুপার হুংকার ছাড়ল, 'Chase him—Chase him to death. উহাকে পাকড়াও।'

ছুটল পাঁচ-পাঁচটা ফিরিঙ্গীর ঘোড়া। সঙ্গে সঙ্গে রাইফেলের অশ্রান্ত গুলি।

পঞ্জাবের সুদূর প্রান্তরের প্রান্তে তখন শুধু দেখা যাচ্ছে মানুষ নয়—ঘোড়া নয়, ছোট্ট একটা বিন্দু—যেন ধাবমান কোনো নতুন নক্ষত্র।

গুজবের হাওয়া

গাঁয়ের মানুষেরা হঠাৎ একদিন অবাক হয়ে দেখল—শহর লুধিয়ানার ধনী মানুষেরা, যত মহাজন ব্যবসায়ী ইজারাদার পত্তনিদার, জোতজমির বড় বড় মালিকের দল ছুটে আসছে গ্রামের দিকে। পূর্ব-দক্ষিণ পঞ্জাবের খাঁ খাঁ করা মাঠপ্রান্তর ভরে উঠল তাদের কলরবে। গ্রাম দেহাতের সরু সরু পথ ধরে এগিয়ে আসছে গোরু ভৈঁসের গাড়ির সার। কোথাও কোথাও সংকীর্ণ পথ অবরুদ্ধ—কে আগে যাবে তাই নিয়ে ঠেলাঠেলি।

ফ্যালফ্যাল করে অবাক হয়ে দেখতে লাগল গ্রামের কিষাণ মজুরের দল। কোনো গাড়ি সামান্য ছই দেওয়া—তাতে চেপে বসে আছে কাচ্চা-বাচ্চা মেয়ে

বুড়ো—কাঁদছে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে, কারুর চোখে জমাট ভয়। কোনো গাড়ি ঘর-সংসারের তৈজসপত্রে ঠাসা। কোনো কোনো গাড়িতে বস্তাবন্দী বড় বড় গাঁটরি, তোরঙ্গ, কাঠের সিন্দুক। হয়তো ওতে মূল্যবান কিছু আছে—কারণ ওগুলোর সঙ্গে রয়েছে ঘোড়সওয়ার পাহারাদার। পায়ে হেঁটেও আসছে ঢের মানুষ। বোধ করি তারা শহর থেকে গাড়ি জোগাড় করতে পারেনি। গ্রামের মানুষ দেখলেই শুধোচ্ছে:

'গাড়ির পাত্তা আছে ভাইয়া—দুটো হোক একটা হোক, বয়েল হোক ভৈঁস হোক, মিলবে?'

গ্রামের মানুষেরা পাল্টা শুধোয়, 'যাবে কোথায়?'

কত গ্রামের নাম বলে ওরা—কোনটা পাঁচ ক্রোশ, কোনটা দশ ক্রোশ। কোনটা বা বিশ ক্রোশ।

'আসছ কোথা থেকে?'

'লুধিয়ানা শহর।'

'সবাই শহর থেকে আসছ?'

এতগুলো লোক ঠেলাঠেলি করে চলে আসছে শহর থেকে! কেন? শহরে কি আগুন লাগল, না, পিলেগ! গাঁয়ের মানুষের কৌতূহলের শেষ নেই। তাই আবার শুধোয়:

'কেন—তোমরা চলে আসছ কেন?'

'দুশমন এসে গেল ভাইয়া।'

'কোন্ দুশমন? ফিরিঙ্গী?'

গাঁয়ের কিষাণ কামিন, এক দুশমনেরই নাম শুনে এসেছে—সে ফিরিঙ্গী। এতদিন ওদের রাজ্যপাট অধিকার করেছে যারা, যাদের হাতে বন্দী হয়েছিল ওদের রানী ঝিন্দন বাঈ আর রাজপুত্র দলিপ—সেই একমাত্র দুশমনকেই ওরা মনে রেখেছে।

কিন্তু শহরের ধনী মানুষেরা বললে, 'দুশমন আজ ফিরিঙ্গী নয়—দুশমন আজ পুরবিয়া সিপাহী।'

'কাহে? ক্যায়সে?'

পুরবিয়া সিপাহীরা এসে তামাম লুধিয়ানা শহর ছারখার করে দিয়েছে—রটে গেল গাঁয়ের মানুষের মুখে মুখে। আরও কত রকম আজগুবি রটনা—কার নাক কেটে দিয়েছে, কার কান কেটে দিয়েছে, কার চোখ উপড়ে ফেলেছে, কাকে ফাঁসী দিয়েছে। সবার বড় উত্তেজনার কথা, খালসাদের ঝুঁটি কেটে দিচ্ছে। কাজটা

করছে নাকি মুসলমান সিপাহীরা—ওরা এবার যোগ দিয়েছে পুরবিয়া হিন্দুদের সঙ্গে।

গ্রাম-গ্রামান্তরের পথ বেয়ে চলেছে শহর থেকে পালিয়ে-আসা মানুষের দল—আর গুজব ছড়িয়ে পড়ছে হাওয়ার বেগে। গাঁয়ের কামার কুমোর ছুতোর অচ্ছুৎ খেতমজুরের দল—যারা চিরকাল গ্রামের নিরুদ্বিগ্ন জীবন কাটিয়ে এসেছে তারা হয়তো ভয় পেল কথাগুলো শুনে। কিন্তু পুরানো খালসা রক্ত হয়ে উঠল গরম। তেমন খালসা লুধিয়ানার গ্রামে গ্রামে কম নয়। পঞ্জাব ইংরেজ অধিকারে চলে যাওয়ার পর পরাজয়ের গ্লানিতে, ক্ষোভে ও অভিমানে তারা সৈনিক বৃত্তি ছেড়ে মন দিয়েছিল চাষবাসে। তাদের মধ্যে প্রবীণ আছে, নবীন আছে। আছে দরবারা সিং—ধিয়ান সিং, দীপ সিং। এমন দিনে গ্রামে নেই শুধু দরবারা।

উত্তেজিত দীপ সিং বললে, 'এসব কী শুনছি বাবা?'

কপাল কুঁচকে ধিয়ান সিং বলল, 'তাই তো! দরবারার ফিরতে দেরি হচ্ছে কেন—তাও তো বুঝতে পারছি না। সে তো বলে গেল—একদিন পরেই ফিরবে।'

দীপ সিং বলল, 'আমার তো আসল কথাটা ঝুটমুট মনে হচ্ছে না। সেই আওরঙ্গজেবের সময় থেকে মুসলমানদের সঙ্গে আমাদের বিরোধ। প্রাণ দিয়েছেন গুরু তেগ-বাহাদুর, প্রাণ দিয়েছেন বান্দা বৈরাগী। সঙ্গে কত খালসার জীবন গেছে। ...'

ধিয়ান বলল, 'ওসব তো ঝুটমুট নয় বেটা। ওদের সাহায্য নিয়েই তো ফিরিঙ্গীরা আমাদের লাহোর অমৃতসর—তামাম পঞ্জাব অধিকার করে

দীপ সিং বলল, 'শুধু মুসলমান সিপাহী কেন, পুরবিয়া সিপাহীরাও ফিরিঙ্গীদের হয়ে পঞ্জাবে লড়েছে। সে তো নিজের চোখে দেখেছি চিলিয়ানওয়ালা আর গুজারাটের শেষ লড়াইয়ে।'

ধিয়ান সিং বললে। 'ঠিক বাত। তবে কদিন আগে দিল্লীর এক মুসলমান ফকিরের সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল। তার মুখে খবর পেয়েছিলাম—কি মুসলমান, কি হিন্দু দেশোয়ালী—সব সিপাহী নাকি ফিরিঙ্গীদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছে। আমার অনুমান—দরবারা গেছে সেই খবরটা আনতে। ও পশম সওদা করতে যাওয়ার কথা ঝুটমুট। কিন্তু সে তো এখনও ফিরে এল না!'

দীপ সিং বলল, 'একবার লুধিয়ানা শহরে গিয়ে খাঁটি খবরটা নিয়ে আসি বাবা।'

ধিয়ান সিং বলল, 'তুই না—আমিই বরং যাচ্ছি।'

'না।' দীপ সিং বলল, 'তুমি থাক। তোমার ঘাড়ে কাজ কারবারের ঢের ভার। তোমার যাওয়া হয় না। ওদিকে সত্যি সত্যি কি হচ্ছে আমরা কেউ জানি না। কি হয় না হয়—'

ধিয়ান সিং তার বলিষ্ঠ উন্নতদেহ যৌবনদীপ্ত ছেলের দিকে এক দৃষ্টে তাকিয়ে রইল কিছুক্ষণ। তারপর আস্তে আস্তে বলল, 'তুই আমার একই বেটা দীপ। তোকে আমি পাঠাই কি করে ? বরং তুই থাক—আমি খবর নিয়ে আসি।'

'না।' ঘাড় ষোটা করে দীপ সিং বলল, 'এখানে তোমার দায়িত্ব ঢের। আমিই যাবো।'

দীপ সিংয়ের মুখের দিকে এক দৃষ্টে চেয়ে চেয়ে ম্লান করুণ গলায় ধিয়ান সিং বলে উঠল, 'দীপ ! বেটা !'

দীপ সিং বলল, 'যদি লড়াই হতো—তুমি খালসা সিপাহীর বাপ, যেতে দিতে না আমাকে ? যেতে দিতে না দুশমনের সঙ্গে লড়তে ? বলো ?'

ক্ষীণ কণ্ঠে ধিয়ান সিং বললে, 'এ তো ঠিক লড়াই নয় দীপ। আজ পঞ্জাবে কে দুশমন—কে কী, কিছুই ঠিক বুঝছি না বেটা, ফিরিঙ্গীরা সব ধাঁধা লাগিয়ে দিয়েছে। আজ দরবারা থাকলে বড় ভাল হতো।'

'তুমি ভেবো না বাবা, আমি শহর থেকে খবরটা নিয়ে চলে আসবো। দুশমন ঠিক আজ কে—এইটে জেনেই চলে আসবো। লড়তে যদি হয় তবে একা বোকার মতো লড়াই করে মরবো না। ফিরে এসে আমার দলবল নিয়ে লড়তে যাবো—যদি মওকা মেলে।··· এই গাঁওর ভিতরে বসে খেত-খামার আমার আর ভাল লাগছে না।'—বলতে বলতে দীপ সিং আস্তাবলের দিকে এগিয়ে গেল লম্বা লম্বা পা ফেলে। ওখানে তার ঘোড়া বাঁধা আছে।

ধিয়ান সিংও এগিয়ে গেল আস্তাবলের দিকে।

দীপ সিং ঘোড়া সাজিয়ে চড়ে বসল লাফ দিয়ে।

ঘোড়ায় চেপে ধিয়ান সিংও চলল তার পাশে পাশে। আস্তে আস্তে বলতে বলতে চলল, 'হুঁশিয়ার হয়ে শহরে ঢুকবি দীপ, অকারণ বিপদের ঝুঁকি নিবি না বেটা। বরং পারলে শহরের আশপাশ থেকে খবরটা বোঝবার চেষ্টা করবি।'

ওদের পিম্পল গাঁওর সীমা পার হওয়ার আগেই দুই ঘোড়সওয়ার থমকে দাঁড়াল। প্রায় খান ছয়েক ভৈঁস বয়েলের গাড়ি মালপত্র আর মানুষে বোঝাই হয়ে ঢুকছে ওদের পিম্পল গাঁওর মধ্যেই। মানুষ বোঝাই গাড়িটা সামনে। ছইয়ের ভেতরে কাচ্চাবাচ্চা মেয়ে আছে। ছইয়ের সামনে বসে আছে একজন আধবুড়ো। তাকে দেখে কেমন চেনা চেনা মনে হয় ধিয়ানের। তাই তো !···

সে মানুষটাও চেয়ে চেয়ে দেখছে ধিয়ানকে—বোধকরি তারও চেনা চেনা মনে হচ্ছে।

'আরে ধিয়ান সিং না?' গাড়ির ওপর থেকে বলল জওহর সিং।

'তোমার ছেলেবেলার বন্ধুকে কি চিনতে কষ্ট হচ্ছে জওহর?' ধিয়ান সিং বললে, 'আমি কিন্তু তোমাকে আগেই চিনেছি।'

গাড়িটা থেমে গেছে। ওরা কথা বলছিল।

দীপ সিং তীক্ষ্ম দৃষ্টিতে চেয়ে চেয়ে দেখছিল জওহর সিংকে। নীচু গলায় বাপকে জিজ্ঞেস করল, 'এই কি সেই জওহর সিং—লুধিয়ানার ফিরিঙ্গীদের দুর্গে যে রসদ জোগায়?'

'ওদের আরও ঢের রকমের কারবার আছে বেটা। দাঁড়া—ওর কাছ থেকে কিছু খবর পাই কিনা।' নীচু গলায় জবাব দিল ধিয়ান সিং। তারপর হেঁকে বলল জওহর সিংকে, 'তা তুমি হঠাৎ চলে এলে গ্রামে?'

'হাঁ, হঠাৎই চলে আসতে হলো ধিয়ান।' জওহর সিং বলল, 'শহরের অবস্থা খুব খারাপ। চলে আসতে হলো জান প্রাণ নিয়ে।'

'বটে!' ধিয়ান সিং বলল, 'একটু খুলে বলো তো ভাইয়া।'

'মুসলমান আর পুরবিয়া সিপাহীরা তামাম উত্তর পঞ্জাবে মার খেয়ে ভেগে আসছে শতদ্রুর এপারে। পঞ্জাবের গ্রামকে গ্রাম জ্বালিয়ে পুড়িয়ে খাক্ করে দিয়ে এগিয়ে আসছে।—হয়তো ওরা আজ লুধিয়ানায় পৌছে গেল।' জওহর সিং বলল, 'আমি দু'দিন আগেই কাচ্চাবাচ্চা নিয়ে বেরিয়ে পড়েছি শহর ছেড়ে। এখন ওখানে কি লঙ্কাকাণ্ড হচ্ছে ঠিক বলতে পারছি না।'

চঞ্চল হয়ে উঠল দীপ সিং। নীচু গলায় বাপকে বলল, 'আমি যাচ্ছি বাবা।'

ধিয়ান শুধু ক্ষীণ কণ্ঠে বলল, 'হুঁশিয়ার হয়ে যাবি বেটা। জল্‌দি ফেরা চাই।'

দীপ সিং ঘোড়া ছুটিয়ে চলে গেল।

জওহর সিং জিজ্ঞেস করল, 'লোকটা কে? চিনতে পারলাম না তো। আমার দিকে এমন কটমট করে তাকাচ্ছিল কেন!'

ধিয়ান সিং জোর করে হেসে বলল, 'তোমাকে ঠিক চেনে না তো। আর চিনবেই বা কি করে? বোধকরি আজ চল্লিশ বছর তুমি গ্রাম ছাড়া। গ্রামের পাট চুকিয়ে তোমরা চলে গেলে শহরে। ও আমার বেটা দীপ সিং।'

জওহর সিং জিজ্ঞেস করল, 'তোমার বেটা কোম্পানীর পল্টনে নেই?'

সে-সব কথা চেপে গেল ধিয়ান সিং। যে লোকটা দুর্গে রসদ জুগিয়ে ফিরিঙ্গীর

রুপা কুড়িয়ে শহর লুধিয়ানায় দু'মহলা তিন মহলা কোঠা বানিয়েছে—কি হবে তাকে তাদের দুঃখের কথা বলে ? কে জানে হয়তো খারাপই হবে।

ধিয়ান সিং শুধু বলল, 'না, ও পল্টনে নেই। আমার সঙ্গে খেতি-খামার করে। যাক সে কথা—রাস্তায় আর দাঁড়িয়ে না থেকে চলো এগোই। নিশ্চয়ই আসতে খুব কষ্ট হয়েছে তোমাদের—দু'দিন রাস্তাতেই তো কেটে গেছে।' ধিয়ান নিজেই সামনের গাড়োয়ানকে বলল, 'চলো হে—বরাবর সিধা।'

গাড়িগুলো চলতে শুরু করলো। ধিয়ান চললো ঘোড়ায় চেপে জওহর সিংয়ের গাড়ির পাশে পাশে।

জওহর সিং বলল, 'শহর থেকে ছুটে তো এলাম থাকব বলে। কিন্তু আমাদের ঘরবাড়িটা ঠিক আছে তো হে ?'

'কি যে বল !' জওহরের কথাটাকে রসিকতা ভেবে ধিয়ান সিং খুব জোরে হেসে উঠল। বলল, 'তোমাদের কোঠা বাড়ি।—অত সহজে ভেঙে পড়বে ! তবে হ্যাঁ—তিন পুরুষের কোঠা, তোমরা শহরে সব চলে গেলে ছেড়ে ছুঁড়ে দিয়ে, তাই চারদিকে একটু জঙ্গল জঞ্জাল হয়ে গেছে। দু-একখানা ঘরের হয়তো সারাই মেরামত এক-আধটুকু করতে হতে পারে।'

পিম্পল গাঁওর একমাত্র কোঠাবাড়ি জওহর সিংদের—ওরা ঠিক জমিদার না হলেও ঢের জোতজমির মালিক। পাঁচিল ঘেরা মস্ত বাড়ি, সামনে দেউড়ি। ওর বাপের কালে ছিল জমিদারী চাল, পাইক বরকন্দাজ, নানা উৎসব আসনাই। তারপর সবাই চলে গেল শহরে—জমি-জমার আয়ে ফেঁদে বসল ব্যবসা। তারপর কত ওলট-পালট হ'লো পঞ্জাবের ইতিহাসে—ওদের ব্যবসার কিন্তু ওলটপালট হয়নি ! বরং নানাদিকে তার শ্রীবৃদ্ধিই ঘটেছে।

জওহর সিং জিজ্ঞেস করল, 'তুমি তো সেনাবাহিনীতে ছিলে শুনেছিলাম।'

ধিয়ান সিং নিজের সে-সব কথা চেপে গিয়ে শুধু বলল, 'বুঢ়া হয়ে গেছি ভাই। সে-সব ছেড়ে দিয়ে এখন খেত-খামার করি। তাঁত চালাই।'

জওহর সিং বলল, 'তোমার ছেলেকে বাহিনীতে পাঠালে পারতে। জওয়ান মরদ—খেত-খামার করবে কেন ? এখন ফিরিঙ্গীদের বাহিনীতে ঢোকার সুবিধা আছে ঢের। পুরবিয়া দুশমনদের সঙ্গে মোকাবিলার জন্যে এখন পঞ্জাবীদের খুব তোয়াজ করছে আংরেজরা। বুঝলে না—ঝোপ দেখে কোপ মারো। তবে তো উন্নতি। পুরবিয়া মুণ্ডু এখন যতগুলো কেটে দেখাতে পারবে—ততো শ' টাকা।'

ধিয়ান সিং চমকে উঠল, 'বলো কী !'

'সাচ্ বাত্, ধিয়ান সিং ভাই—খাঁটি বাত বলছি।' জওহর সিং বলল, 'উত্তর

পঞ্জাবের পাহাড়িয়াদের লেলিয়ে দিয়েছে আংরেজরা। দুশমনদের মুণ্ডু কেটে ওরা হাজার হাজার রুপেয়া কামিয়ে নিচ্ছে।'

ধিয়ান সিংয়ের মুখটা থমথম করতে লাগল।

জওহর সিং বলল, 'তুমি আমার ছেলেবেলার দোস্ত। তাই তোমাকে বলছিলাম—বেটাকে পাঠিয়ে দাও।'

ধিয়ান সিং গ্রামের প্রায় শেষ প্রান্তে এসে থমকে দাঁড়াল। বলল, 'এসে গেছি জওহর। এই ঝোপগুলোর পেছনে তোমাদের বাড়ি।'

জওহর সিং গাড়ি থেকে নেমে ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে রইল। যেন চিনতে পারছে না। বলল, 'অ্যাঁ—ভিটের এই হাল হয়েছে? এ যে জঙ্গল হয়ে গেছে ধিয়ান!'

'তা একটু হয়েছে। গাঁয়ের শেষপ্রান্তে তোমাদের বাড়ি—তাই এদিকে বড় একটা কেউ আসে না তো।'

'অথচ জানোই তো, সব দেখা-শোনার জন্যে একটা কামিন আছে—মাস মাস বেটা শহরে গিয়ে মাইনে নিয়ে আসে।'

ঝোপ জঙ্গল পার হয়ে নিজের বাড়ির সামনে এসে দাঁড়াল জওহর সিং। এখানে ওখানে বাউণ্ডারী পাঁচিল ধসে পড়ার মতো—এক জায়গায় তো ভেঙেই পড়েছে। দেউড়ি জরাজীর্ণ—তবে দাঁড়িয়ে আছে এখনো। বট অশ্বত্থের গাছ গজিয়েছে কোঠার গায়ে। খসে পড়েছে পলেস্তারা। একটা পুরোনো মর্চে ধরা তালা ঝুলছে দেউড়ির দরজায়। দেখাশোনার ভার যে লোকটার ওপর—তার কোনো পাত্তাই নেই।

জওহর সিং বলল, 'এ যে ভূতের বাড়ি হয়ে গেছে ধিয়ান!'

ধিয়ান বলল, 'কত দিন এ বাড়ি ছেড়ে চলে গেছ—হিসেব কর জওহর।'

চোস্ত ইংরেজীতে ধিয়ানের পেছন থেকে কে একজন বলে উঠল, 'বাসের অযোগ্য।'

পেছন ফিরে তাকাল ধিয়ান—চিনতে পারল না: একেবারে পুরাদস্তুর সাহেবী পোশাক। তরুণ যুবক। ছিল কোন গাড়ির ভেতরে—এখন বেরিয়ে এসেছে।

জওহর সিং পরিচয় করিয়ে দিয়ে বলল, 'ও আমার ছেলে অজিত। ও বলছে—এ বাসের অযোগ্য।'

ধিয়ান সিং একটু হেসে বলল, 'অযোগ্য হবে কেন বেটা—বাস করলেই যোগ্য হবে। লোকজন লাগিয়ে সাফসুফ করতে হবে।'

জওহর সিং ধিয়ান সিংয়ের একটা হাত চেপে ধরে বলল, 'একটু সাহায্য কর

ভাই ধিয়ান—লোকজন লাগিয়ে একটু সাফসুফের ব্যবস্থা করে দাও। আর আমার কামিনটারও খোঁজ করতে হবে। বুঝতেই পারছ—কতদিন গাঁ ছাড়া, গাঁয়ের কাকে গিয়ে কি বলব! কী বিপদেই যে পড়লাম।'

'ঘাবড়াও মৎ ভাইয়া।'

কাজের মানুষ ধিয়ান সিং। রাজনীতি—ভেদনীতি—অর্থনীতি—এ সবে তার মাথা ঘুলিয়ে যায় কিন্তু কাজে সে দশটা। কিছুক্ষণের মধ্যে গাঁ থেকে লোকজন ডেকে এনে ঝাড় মোছ, সাফ-সুফ মায় ঝোপজঙ্গল কেটেকুটে সবটা সে ঝকঝকে করে তুলল। খোদ জওহর সিং মজুর কামিনদের কাজ কর্ম কিছুক্ষণ ঘুরে ঘুরে দেখার পর ক্লান্ত হয়ে ঘরের মধ্যে গিয়ে ঢুকল। আর একবারও বের হলো না। তার সাহেব-বেটা অজিত সিংও কোটপাৎলুনের ধুলো ঝাড়তে ঝাড়তে সরে পড়ল এক সময়ে। একা ধিয়ান সিং সকলের কাজকর্ম দেখে বেড়াতে লাগল। সাফসুফের কাজ যখন শেষ হলো সূর্য তখন মাথার ওপর থেকে পশ্চিমে ঢলে পড়েছে।

মজুর কামিনদের মজুরি মেটাতে বেরিয়ে এল জওহর সিংয়ের সাহেব-বেটা অজিত সিং! মাথা পিছু আনা আনা। মজুর কামিন সব খুশি হয়ে চলে গেল। গ্রামে তখন এই এক আনা মজুরিই ঢের।

ধিয়ান সিং দেউড়ির সামনে ভাঙা একটা পৈঠার ওপরে বসল চেপে। পাগড়ি খুলে কাপড়ের ঝটকা দিয়ে হাওয়া খেতে লাগল।

তার চেপে বসার ঢঙ দেখে টাকার থলির ভেতর হাত ঢুকিয়ে অজিত সিং ভাবতে লাগল—এই বুড়োটাকে মজুরি কত দেওয়া যায়। না, সে অনুদার নয়। টাকা পয়সাও আছে ওদের ঢের। অজিত সিং পুরা ষোলো আনাই বের করে ধরল ধিয়ান সিংয়ের সামনে।

ধিয়ান সিংয়ের চোখের দৃষ্টি হঠাৎ ধারাল হয়ে উঠল—তাকাল এক পলক অজিত সিংয়ের দিকে। তারপর ম্লান একটু হাসল। বলল, 'ভুল করলে বেটা। ও পয়সাটা কুলি-কামিনকে দিলে পারতে। যাও, তোমার বাবাকে একবার ডেকে দাও।'

বিব্রত অজিত সিং ভেতরে গিয়ে দাঁড়াল বাপের সামনে।

জওহর সিং শুয়ে ছিল। বলল, 'সব মিটল?'

অজিত বলল, 'তা মিটেছে। কিন্তু সেই ধিয়ান সিং বুড়ো চেপে বসে আছে। ষোল আনা দিতে গেলাম—নিল না। বলল—তোমার বাবাকে ডেকে দাও।'

'আহা, আর ষোল আনা ধরে দিলি না কেন।' —জওহর সিং উঠে বসল। বলল, 'আমাদের কালের পুরোনো খালসা সিপাহী। গরিব আদমি। দে—টাকার থলি আমাকে দে।'

জওহর সিং টাকার থলি নিয়ে বাইরে বেরিয়ে গেল।

কিন্তু আরও ষোল আনা যোগ করে দেওয়ার আগেই হেসে ধিয়ান সিং বলল, 'তোমার বেটা আমাকে মজুরি দিতে এসেছিল।'

জওহর সিং চতুর ব্যবসায়ী। ছেলের উদ্দেশে চোটপাটের ভাব করে বলল, 'ও সব ছোকরা বেকুফদের কথা বাদ দাও ভাই, কার দাম কত—ওরা বুঝবে কি! তোমাকে আরও ষোল আনা—'

ধিয়ান বলে উঠল, 'তুমিও কি টাকা দিতে এসেছ?'

জওহর সিং আমতা আমতা করে বলল, 'না না—মানে—তোমার কিছু নেওয়া উচিত ভাই ধিয়ান। তুমি এতক্ষণ আমার জন্যে বেহক তোমার সময় নষ্ট করলে।'

ধিয়ান সিং বলল গম্ভীর গলায়, 'তুমি আমার ছেলেবেলার দোস্ত ছিলে জওহর সিং।'

জওহর সিং নির্বাক ওর মুখের দিকে তাকিয়ে রইল কিছুক্ষণ—যেন লোকটাকে বোঝবার চেষ্টা করল। তারপর বলল, 'তোমার উপকার আমি ভুলব না ভাই। দেখ, তুমি আমার ছেলেবেলার বন্ধু—একটা কথা তোমাকে বলি। লুধিয়ানার দুর্গে এক আংরেজ কাপ্তেনের সঙ্গে আমার খুব ভাব-সাব আছে। কাপ্তেন টমাস। যদি তোমার বেটা বাহিনীতে ঢুকতে চায়—আমি একটা চিঠি লিখে দিতে পারি।'

ভেতরে ভেতরে জলে উঠল ধিয়ান সিং। কিন্তু তার স্বভাব—সহসা সে রাগ দেখায় না। মুখে হাসি টেনে বলল, 'তার দরকার নেই জওহর।'—বলে উঠে দাঁড়াল।

জওহর সিং একটু উপকারের প্রতিদান দিতে চায়। সাগ্রহে বলল, 'তবে কখনো কিছু যদি দরকার হয়—ব'লো। কতদিন গ্রামে থাকতে হবে কে জানে।'

বিদ্রোহী লুধিয়ানা

খাঁটি খবর নিয়ে এল দীপ সিং। দলে দলে শতদ্রু পার হয়ে আসছে বিদ্রোহী সিপাহীরা। ফিরিঙ্গীদের লুধিয়ানা দুর্গের পতন হয়েছে। ফিরিঙ্গীরা বিধ্বস্ত।

দেখতে দেখতে আগুনের মতো ছড়িয়ে পড়ল কথাটা গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে। ঘোড়া ছুটিয়ে দীপ সিং তার দলবল সংগ্রহ করে ফেললে অতি দ্রুত।

ধিয়ান সিংয়ের মতো বয়স্ক শান্ত মানুষও চঞ্চল হয়ে উঠল। তার ইচ্ছে হলো ওই সব জোয়ানের দলে মিশে ঘোড়া ছুটিয়ে চলে যায় লুধিয়ানা শহর। কিন্তু দরবারা তাকে জড়িয়ে দিয়ে গেছে তাঁত-শালের সঙ্গে। লোকটা নিজের মনে বক্ বক্ করতে লাগল।

ওদিকে সাজ সাজ রব পড়ে গেল দীপ সিংয়ের দোস্ত মহলে :

'মওকা মিল গিয়া।'…

প্রতিশোধের সুযোগ এসে গেছে। বহু দিনের গুমরে মরা পরাজয়ের সমস্ত গ্লানিকে ঝেড়ে ফেলে দিয়ে হাল্লা করে তারা এসে দাঁড়ল পথে। সেজে দাঁড়াল জোয়ান ছোকরাদের টগবগে ঘোড়া।

দীপ সিং একই ছেলে ধিয়ানের—কিন্তু ধিয়ান আজ পিছু-টান দিলে না। গম্ভীর শান্ত গলায় শুধু বলল, 'কিন্তু ফিরিঙ্গীদের যে বহুৎ কামান আছে, বন্দুক আছে বেটা। তোমা কতটা কী করবি!'

দীপ সিংদের বন্দুক নেই, একটা পিস্তলও নেই। খালসা বাহিনী ভেঙে দেওয়ার সময় ফিরিঙ্গীরা ওদের বন্দুক পিস্তল যার যা ছিল সব কেড়ে নিয়েছে। এখন সম্বল ওদের এক-একখানা কৃপাণ আর বর্শা।

দীপ সিং বলল, 'ফিরোজপুরে ফিরিঙ্গীদের খুব বড় বড় অস্ত্রাগার আছে—সে তো জানোই। সিপাহী ভাইয়াদের সাহায্য নিয়ে ফিরোজপুর দখল সহজ হয়ে যাবে। ফিরিঙ্গীরা সব ভয়ে ছত্রভঙ্গ। এই মওকা। ঘাবড়াও মৎ।'

যাওয়ার আগে দীপ সিং দেখা করে গেল দেবীর সঙ্গে।

দেবী বড় বড চোখ করে তাকাল যুদ্ধের সাজ পরা ভাইয়ের দিকে। বলল, 'লড়াইতে তাহলে যাচ্ছ ভাইয়া সত্যি!'

দীপ সিং হেসে বলল, 'কেন—তোর কি মনে হচ্ছে আমরা এতগুলো জোয়ান ফিরিঙ্গীদের পায়ে তেল মালিস করতে যাচ্ছি?'

'না ভাইয়া—না, আমি তা বলছি না।'—মুহূর্তে দেবীর মুখ চোখ লাল হয়ে উঠল নিজের স্বামীর কথা মনে করে। সগর্বে ভাইয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, 'দেবীর ভাইয়া তেল মালিস করতে যাবে না—সে আমি জানি। বহুৎ দিন তোমরা লড়াইয়ের কথা ভুলে গেছলে কিনা—তাই বলছি। তামাম পিপ্পল গাঁওর খালসারা খেতখামারে আটকে গেছলে—তাই বলছিলাম।'

'যাই বহিন।'

'উঁহু—দাঁড়াও।' দেবী বলল, 'আমি তোমাকে তিলক দেবো—লড়াইয়ে জয় হবে।'

দীপ সিংয়ের কপালে, তার জোয়ান বন্ধুদের কপালে দেবী রক্ত চন্দনের তিলক এঁকে দিল। তারপর ফিসফিস করে দীপ সিংকে বলল, 'আমার শ্বশুরের খোঁজ কোরো। আমার মন বলছে—নিশ্চয়ই তিনি বিদ্রোহী ভাইয়াদের সঙ্গে আছেন।'

খালসা সিপাহীর গাঁ। দরজায় দরজায় মা বৌ বহিনরা দাঁড়িয়ে দেখল। চোখে ওদের জল—আপনি উথলে উঠছে, কিন্তু মুখে একটি কথা নেই, একটি নিষেধ নেই, কাকুতি নেই। যেন সব পাথর। সৈনিকের ঘর সংসার এমনিই হয়।

জোয়ানের দল ঘোড়া ছুটিয়ে চলে গেল। পিপ্পল গাঁওর মাঠ প্রান্তর কাঁপিয়ে দিয়ে ওদের উচ্চকিত জিগির ছুটে গেল দিগন্তে :

'ওয়া গুরুজী কি ফতে … এ … এ …'

পথের মাঝখানে নিশ্চল দাঁড়িয়ে ধিয়ান সিং আর তার বেটি দেবী। ওদের মুখ শুকনো, ওদের চোখ শুকনো, চোখে ওদের পলক পড়ে না।

মুক্তির স্বাদ বড জন্মগত, এর উত্তেজনা বড় ছোঁয়াচে। ক্ষেপিয়ে দিলে দর-
বারার তাঁতশালের তাঁতী আর কারিগরদেরও। তাল ঠুকে তারাও কাজ বন্ধ করে
দিয়ে বলল, 'আমরাও যাবো।'

'সব কাজকর্ম বন্ধ হয়ে যাবে যে!' ধিয়ান সিং বিব্রত হয়ে বলল, 'খোদ
মালিক জানলে বলবে কী!'

ধিয়ান সিং ভারি মুস্কিলে পডে গেল। দরবারা সিং বড সমস্যায় ফেলে গেছে
তাকে। দরবারা তাকে বলবে কী? কিন্তু ঠেকাবে কাকে ধিয়ান সিং?

দেবী বলল, 'যারা যেতে চায়—যেতে দাও বাবা।'

ধিয়ান বলল, 'কারবার কারখানা আমার নয়—তোর শ্বশুরের। আমি ভাবছি,
তোর শ্বশুর যদি কিছু মনে করে!'

দেবী সাহস দিয়ে বলল, 'তুমি কিছু ভেবো না বাবা। আমার শ্বশুরকে
আমি ভালো করে জানি। তিনি বরং খুশি হবেন।'

তাঁতী কারিগররা হাল্লা করে ছুটল লুধিয়ানা শহরের দিকে।

এত হৈ-হল্লা গোলমাল, এ অভিযানের এত সাজ-সজ্জা—এসবের কিছুই জানত
না জওহর সিং। যখন জানল, তখন বড দেরী হয়ে গেছে। তার বিপুল দেহভার
নেড়ে ছুটে এল ধিয়ান সিংয়ের কাছে। বলল, 'ওরা সব যাচ্ছে কোথায়?'

'আর কোথায়—সব লুধিয়ানা।' ধিয়ান সিং বলল, 'লুধিয়ানায় ফিরিঙ্গী দুর্গের
পতন হয়েছে।'

'ঝুটবাত।' জওহর সিং বলল, 'ওদের ফেরাও—ওরা তো তোমার লোক।
আমি বলছি—ওরা মরবে।'

ধিয়ান সিং চুপ।

জওহর সিং বিচলিত হয়ে বলল, 'বুঝতে পারছ না ধিয়ান, ওরা তাড়া পেয়ে
ছুটে আসবে আমার এই গাঁয়েই। সঙ্গে ফিরিঙ্গীদের পথ দেখিয়ে আনবে।
তখন ওরা তো মরবেই—তার সঙ্গে আমরাও।'

ধিয়ান তবু চুপ।

জওহর ওর কাঁধ ধরে ঝাঁকি দিয়ে বলল, 'ওদের ফিরতে বলো—দোহাই
তোমার। গাঁয়ে ছুটে এসেছিলাম নিশ্চিন্তে থাকব বলে। বলো ওদের ভাই।'

'কাকে বলব জওহর—কাকে আজ ফেরাবে তুমি! ওই দেখ, আবার কোন
গা থেকে ছুটে আসছে খালসার দল।'—ধিয়ান সিং আঙুল তুলে দেখিয়ে দিলে—
আরও বড় দল ছুটে চলেছে পিম্পল গাঁওর দূর প্রান্তর দিয়ে। ধূলো উড়ছে
তাদের পায়ে পায়ে। ধিয়ান বলল, 'আমিও যেতাম—শুধু দরবারা সিংয়ের এই

কারখানা আর আমার এই হতভাগী বেটির জন্য যাওয়া হলো না। বেকুফের মত পরের জিনিস আগলে বসে রইলাম!'

শুধু পিম্পল গাঁও নয়—এমনি গ্রাম-গ্রামান্তর থেকে ছুটে চলেছে শিখের দল। গোটা হিন্দুস্থান কত বড—এ তারা জানে না। ইংরেজের শক্তি কতখানি, কি তার কূট কৌশল, এ-ও তারা বোঝে না। তারা শুধু জানে—তাদের গৌরবের স্বাধীন পঞ্জাব আর নেই, তাদের গর্বের লাহোর দরবারে জাঁকিয়ে বসেছে বিদেশী বিধর্মী ফিরিঙ্গী। তাদের প্রধান গুরুদ্বার অমৃতসরের মহিমা আজ নষ্ট হয়ে গেছে। এই ফিরিঙ্গীগুলোর কাছে লডাইতে তারা একদিন হেরে গেছে। সৈনিকের জাত ওরা—পরাজয় ওদের কাছে মৃত্যুর চেয়েও যন্ত্রণাদায়ক। আজ মওকা পাওয়া গেছে সেই অপমানের শোধ নেওয়ার। খবর পেয়েছে ওরা—সেই ফিরিঙ্গীর আসন আজ টলোমলো।

গুজারাটের শেষ শিখ যুদ্ধে হেরে হয়তো ওরা হতাশায় নির্তেজাল চাষীই বনে যেত। কিন্তু বাঁচিয়ে দিল ভাইনী গ্রামের নামধারী গুরু রামদাস এবং তাঁর পার্শ্বচর কিছু পুরাতন খালসা বাহিনীর শিখেরা। নানা ক্রিয়াকর্ম, উপদেশ ও প্রচারের দ্বারা জ্বালিয়ে রেখেছে ওরা স্বাধীনতার স্বপ্নকে ধিকি ধিকি তুষের আগুনের মতো। সে আগুন—পঞ্জাবের হৃত গৌরব উদ্ধারের আগুন, তার জন্য ধীরে ধীরে সংগঠিত হয়ে ওঠার আগুন, বেইমানকে অবিশ্বাস ও ঘৃণা করার আগুন। সারা লুধিয়ানায় তখন এই নামধারী বা কুকাদের প্রভাব ছড়িয়ে পড়েছে। পুরানো খালসা সিপাহীদের সঙ্গে হাত মিলিয়েছে তখন চিরকালের অত্যাচারিত ও নিপীড়িত গরীবের দল—মহাজনের ফাঁদে পড়া গ্রামের কৃষক, কারিগর, কামার, চামার, খেতমজুর। অন্যদিকে অভিজাত সম্প্রদায় ও মহাজনের দল আরাম, আয়েস ও স্বার্থের লোভে ঢলে পড়েছে তখন ইংরেজের দিকে।

লুধিয়ানা শিখ প্রধান। কিন্তু শুধু আজ শিখ নয়—চলেছে হাজার হাজার উত্তেজিত গুজার মুসলমানও। শতদ্রুর নিম্নাঞ্চলের অধিবাসী ওরা—গরীব কৃষক। লাঠি, বল্লম, কুড়ুল, কাটারি—যে যা পেয়েছে তাই নিয়ে বেরিয়ে পড়েছে ওরা, মুখে লডাইয়ের জিগির। সবুজ নিশান উড়িয়ে আগে আগে ঘোড়ায় চেপে চলেছে ওদের নেতা ও ধর্মগুরু এক মৌলভী। নাম জিয়াউদ্দিন। ইংরেজদের বিরুদ্ধে বার দুই চক্রান্ত করার অপরাধে ইংরেজরা তাকে অন্তরীণ করে রেখেছিল গুজার-দের এলাকায়। শতদ্রুর নিম্নাঞ্চলের কাদায় পাঁকে পড়ে পড়ে এতদিন মৌলভী তৈরী করেছে বারুদ—মাটির সঙ্গে মাটি হওয়া কৃষককে রূপান্তরিত করেছে

বিদ্রোহীতে। আজ সুযোগ বুঝে বেরিয়ে পড়েছে খাঁচাখোলা বাঘের মতো। গুজারদের মধ্যে মৌলভীর প্রভাব অপরিসীম।

লুধিয়ানা শহরের অদূরে এক তিন রাস্তার মোড়ে দু'দলে দেখা।

গুজাররা এল উত্তর-পশ্চিমের রাস্তা ধরে আর শিখরা এল দক্ষিণ দিক থেকে। এখান থেকে দুই রাস্তা এক হয়ে ঢুকেছে লুধিয়ানা শহরে।

দু'দলে জানাশোনা নেই। গুজাররা সন্দিগ্ধ চোখে তাকাল শিখদের দিকে।

শিখরা থমকে দাঁড়াল অল্প দূরে।

ওদের মাঝখানে শুধু খানিকটা রাস্তার ব্যবধান নয়—ব্যবধান আজ সন্দেহের, অবিশ্বাসের। ফিরিঙ্গীর ছড়ানো নানা গুজব ওদের মনে বিজ বিজ করছে পোকার মতো। ফলে মনে হচ্ছিল—এইখানেই বুঝি লড়াই সুরু হয়ে যায়।

গুজার মুসলমানরা ভয়ানক উত্তেজিত হ'য়ে 'নারা' দিতে লাগল : 'দুশমন কো মারো!'

শিখ জোয়ানরাও হুঙ্কার দিয়ে উঠল, 'দুশমন কো মারো!'

কিন্তু দুশমন আজ কে!

উত্তেজনায় ফেটে পড়ল দুই দল।

ওদের এ উত্তেজনা অকারণ নয়। সিপাহী বিদ্রোহের সময়ে কূট-কৌশলী ইংরেজ বাতাসে মিশিয়ে দিয়েছে ভেদনীতির বিষ—ছড়িয়ে গেছে তা সমগ্র পঞ্জাবে। ওরা পঞ্জাব অধিকার করেছিল একদিন পুরবিয়া অর্থাৎ হিন্দুস্থানী সিপাহীদের সাহায্যে। তাই এই সিপাহীদের ওপর একটা চাপা বিদ্বেষ শিখদের মনে এতদিন থিতিয়ে ছিল। সেটাকে আজ সুযোগ বুঝে খুঁচিয়ে জাগিয়ে দিল ধূর্ত ফিরিঙ্গী—লাহোর, অমৃতসর, জলন্ধরের শিখদের লেলিয়ে দিলে বিদ্রোহী সিপাহীদের বিরুদ্ধে। একটি সশস্ত্র বিদ্রোহী সিপাহী ধরে আনতে পারলে ইনাম ৫০ টাকা, নিরস্ত্র সিপাহী ২৫ টাকা।[১] ওই সব অঞ্চল জুড়ে তখন টাকা ছড়িয়ে ইংরেজ অফিসাররা পলাতক বিচ্ছিন্ন বিদ্রোহীদের শিকার করে বেড়াচ্ছে। একই সঙ্গে আবার পঞ্জাবের তদানীন্তন ছোটলাট সার জন লরেন্স একটা ইশ্‌তেহার ছেপে ছড়িয়ে দিয়েছে সারা পঞ্জাবে। তাতে বলা হয়েছে : দিল্লীর মোগল সম্রাট নাকি গোপন নির্দেশ দিয়েছেন তাঁর স্বজাতি মুসলমানদের— যারাই শিখদের হত্যা করবে এবং মাথা কেটে নিয়ে আসতে পারবে তাদের তিনি মোটা পুরস্কার দেবেন।[২] ইংরেজের এ রটনার উদ্দেশ্য—শিখদের

১। মেটকাফ 'টু নেটিভ ন্যারেটিভস্' পৃঃ ১৬৭

২। মীড : 'সিপয় রিভোল্ট' পৃঃ ১৬৩-৬৪

মনে আওরঙ্গজেবের আমলের পুরাতন মুসলমান-বিদ্বেষ আবার জাগিয়ে তোলা।

পঞ্জাবের বড় দুর্দিন। অথচ সৈনিক জাতির এই দেশ—তার সাফল্য ও সম্ভাবনাও প্রচুর। জন লরেন্স তাঁর নোটে লিখছেন: 'বাস্তবিক পক্ষে যখন গত ৪ মাসের ঘটনাবলীর দিকে ফিরে তাকাই, তখন আমরা কি করে বেঁচে আছি, তাই ভেবে আমার খুব আশ্চর্য লাগে। যদি শিখরা আমাদের বিরুদ্ধে যেত তাহলে আমাদের বাঁচাতে পারত, এমন সাধ্য কারও ছিল না। পাঞ্জাবীরা এই সুযোগে তাদের জাতীয় স্বাধীনতা হারানোর প্রতিশোধ নেবার লোভ সংবরণ করবে, এ কেউই আশা করেনি, কল্পনাও করেনি।'[৩]

তাই জ্বলছে—সবটা জ্বলছে সংশয়, বিদ্বেষ আর ঘৃণায়। সেই ধূমায়িত বহ্নির পটভূমিতে দুইদিকে দুই দল—গুজার মুসলমান আর শিখরা পরস্পরের ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়তে উদ্যত। জিগির উঠছে দু দিক থেকে:

'দুশমন কো মারো।'...

মৌলভী জিয়াউদ্দিন প্রবীণ এবং বিচক্ষণ। বিপ্লবী। মাথার চুলে পাক ধরেছে, দাড়ি গোঁফ সাদা। ফিরিঙ্গীদের কূটকৌশলের সঙ্গে তার দীর্ঘ দিনের পরিচয়। ঠেকে শেখা মানুষ। হাত তুলে তার দলবলকে শান্ত করলো। তারপর ঘোড়া থেকে নেমে জন দুই সশস্ত্র পার্শ্বচর নিয়ে এগিয়ে এল শিখদের দিকে। শান্ত সৌম্য মূর্তি। সামনে এসে জিজ্ঞাসা করল, 'আজ লুধিয়ানায় কে তোমাদের দুশমন?'

শিখদের দল থেকে দীপ সিং ঘোড়ার রাশ টেনে ধরে পাল্টা জিজ্ঞেস করল, 'তোমাদের দুশমন কে?'

'দুশমন ফিরিঙ্গী। তামাম লুধিয়ানা থেকে তাদের আজ আমরা খতম করতে বেরিয়েছি।'

শিখরা মুখ চাওয়া-চাউয়ি করল। দীপ সিং বলল, 'আমরাও তো ফিরিঙ্গী খতম করতে বেরিয়েছি।'...

শান্ত দৃঢ় কণ্ঠে মৌলভী বলল, 'তবে তো আজ আমাদের সামনে একই রাস্তা বেটা।' মৌলভী একটু হাসল। বলল, 'তোমরা ও রকম ভাবে থমকে দাঁড়িয়েছিলে কেন?'

দীপ সিং বলল, 'লরেন্সের ইশতেহার নিশ্চয়ই আপনি দেখেছেন?'

'দেখেছি বেটা।' মৌলভী বলল, 'ফিরিঙ্গীদের ও এক জালিয়াতী। সেরেফ

৩। রাইক্স্: 'নোটস অন দি রিভোল্ট' পৃঃ ৭৪

টা বাত। বলো—এই বিদ্রোহে শিখ সিপাহী, মুসলমান সিপাহী কি এক সঙ্গে কোথাও মরেনি ?'

'মরেছে বৈ কি মৌলভী সাহেব।'

মৌলভীর একজন পার্শ্বচর বলে উঠল, 'আবার লাহোর, জলন্ধর, অমৃতসরের শিখরা টাকার লোভে বিদ্রোহী সিপাহীদের ধরিয়ে দিচ্ছে—এ কথাও তো খাঁটি।'

'ওরা অধঃপাতে গেছে, ফিরিঙ্গীর দালাল হয়ে গেছে।' ঘৃণাভরা কণ্ঠে দীপ সিং বলল, 'আমরা লুধিয়ানার শিখ।'

'আমরাও লুধিয়ানার গুজার মুসলমান।' মৌলভী দীপ্ত কণ্ঠে বলল, 'আমাদের রাস্তা এক—নারা এক : ফিরিঙ্গী কো মারো।'

'ফিরিঙ্গী কো মারো।'

সঙ্গে সঙ্গে গর্জে উঠল দু দিকের দু'দল। সামনে দু' রাস্তা এক হয়ে ছুটে গেছে যে লুধিয়ানা শহরের দিকে—ওরা ছুটল সেই দিকে। ঘোড়ার খুরে আর মানুষের পায়ে পায়ে ঘনিয়ে উঠল ধুলোর ঝড়।

দূরে দেখা যায় দুর্গের পরিখা প্রাচীর।

লুধিয়ানা দুর্গের সামনে আজ ভীড়ের অবধি নেই। নানা শ্রেণী ও জাতের মানুষ জড়ো হয়েছে এসে গ্রাম গ্রামান্তর থেকে। কেউ ঘোড়সওয়ার, কেউ পদাতিক—সকলেই রণং দেহি। আরেইন মুসলমানরা প্রধানত সব্জিওয়ালা—সব্জির ব্যবসা ওদের একচেটিয়া। গ্রাম-গ্রামান্তর থেকে ওদের মেয়ে-পুরুষ বয়ে এনেছে নানা সব্জির ডালা। রাজপুত, জাঠ কৃষক—ওরা এনেছে গম, বাজরা। খাওয়ার রসদে দুর্গের সামনে পাহাড় হয়ে উঠেছে। কিছু লোক সে সব বয়ে নিয়ে যাচ্ছে দুর্গের ভেতরে। পুরানো খালসা আর গুজার মুসলমানরা বড় বড় কামানগুলোকে ঠেলাঠেলি করে সাজাচ্ছে শতদ্রুর দিকে তাক ক'রে। ওদিকে শতদ্রুর ওপারে জমায়েৎ হচ্ছে ফিরিঙ্গী বাহিনী।

শহরের বাজার আজ বন্ধ—সেখানে উড়ছে পোড়া ছাই। লুঠপাট, অগ্নি-সংযোগ আর ভাঙাচোরায় সারা শহর হতশ্রী। গীর্জা বাড়ি পরিত্যক্ত শ্মশান। ফিরিঙ্গী অঞ্চল জনশূন্য—এখানে ওখানে পড়ে আছে এখনও লাশ। ভন্ ভন্ করছে মাছি। মালিক মহাজন আড়তদার প্রাণ নিয়ে পালিয়েছে শহর ছেড়ে। নগরীর জনবিরল পথঘাটে একটা চাপা অস্বাভাবিকতা। সবাই এসে জমা হচ্ছে দুর্গের সামনে।

সকলের মুখে কেমন একটা উৎকণ্ঠা ও প্রতীক্ষা।

বিদ্রোহী সিপাহীরা—যারা চলে এসেছে শতদ্রুর ওপার থেকে—তারা দুর্গের ভেতরে সভায় বসেছে। সেখানে ঠিক হচ্ছে বিদ্রোহীদের পরবর্তী কর্তব্য।

তখন বিকেল। সূর্য প্রায় অস্তমিত।

অধীর আগ্রহে দুর্গের বাইরে অপেক্ষা করছে সবাই—সিপাহীরা কখন সভা ভেঙে বেরিয়ে আসবে, কখন দাঁড়াবে এসে কামানের পাশে, গর্জে উঠবে কামান শতদ্রুর ওপার লক্ষ্য করে। প্রতি আক্রমণের জন্য অগ্রসর হবে শতদ্রুর দিকে। নানা চরের মুখে খবর আসছে ওদিক থেকে—ফিরিঙ্গী বাহিনী থমকে দাঁড়িয়েছে শতদ্রুর ওপারে। ওদিক থেকে পার হওয়ার ওরা কোনো তোড়জোড় করছে না।

এমন সময় বিরাট এক বিদ্রোহী সিপাহীর বাহিনী এসে দাঁড়াল ফিরোজপুর থেকে।

সভা ভেঙে দুর্গের ভেতর থেকে বেরিয়ে এল অন্যান্য সিপাহীরা। কি সব খবর দেওয়া নেওয়া হলো ওদের মধ্যে—লুধিয়ানার স্বেচ্ছাসৈনিক উৎকণ্ঠিত মানুষ তা শুনতে পেল না। দুর্গের বাইরে ওরা অপেক্ষা করতে লাগল একটা আসন্ন লড়াইয়ের। গ্রামগ্রামান্তর থেকে ভারে ভারে আসছে সিপাহীদের রসদ। রসদের পাহাড় বাড়ছে একটু একটু করে। কে বলতে পারে—লড়াই কতদিন চলবে।

এমন সময় দুর্গের ভেতর থেকে বেরিয়ে এল বিদ্রোহী সিপাহীদের নেতা লছমন সিং ধারিয়া। রসদের পাহাড়ের দিকে তাকিয়ে ম্লান ভাবে একটু হাসল। বলল, 'আর কি হবে এসব ভাইয়া।'

কলরব করে উঠল লুধিয়ানার মানুষ।

'কতদিন লড়াই চলবে—কে বলতে পারে!'

'কিন্তু আমরা আজই সন্ধ্যার পরে লুধিয়ানা ছেড়ে চলে যাচ্ছি ভাইয়া।'

'তোমরা চলে যাবে!'

ওদের রক্তে যেন বরফের পাহাড় ভেঙে পড়ল।

লছমন সিং বলল, 'আমাদের গোলা বারুদ নেই—লড়াইয়ের আসল রসদ নেই ভাইয়া। যা সঙ্গে এনেছিলাম তাই দিয়ে লুধিয়ানার দুর্গ দখল করেছি। ফিরিঙ্গীরা পালাবার সময় এ দুর্গে কিছুই রেখে যায়নি।'

পেছন থেকে ভিড় ঠেলে এগিয়ে এল দীপ সিং। বলল, 'ফিরোজপুর ওদের বড় অস্ত্রাগার। আমি পুরানো খালসা—আমি ভাল ভাবে জানি। সেখান থেকে অস্ত্রশস্ত্র এনে চলো ওদের শতদ্রুর জলে ডুবিয়ে মারি।'

লছমন সিং ম্লান একটু হেসে বলল, 'ফিরোজপুর ছেড়ে চলে এসেছে আমাদের

বিদ্রোহী ভাইয়ারা। শতদ্রুর ওপার থেকে বহু সেনা পার করে এনে ফিরিঙ্গীরা আমাদের আক্রমণ করবার মতলব করছে।'

'আমরা লড়বো—আমরা মরবো। তোমরা নেতা, বাহিনী চালাও।'

'কিন্তু এখন আমাদের বড় কাজ খাস দিল্লী রক্ষা করা।'

'কিন্তু লুধিয়ানা তো দিল্লীর আগলি ঘাঁটি।'

বাদশাহী সড়ক—এখন যার নাম গ্র্যাণ্ডট্রাংক রোড—সেই সড়ক চলে গেছে লুধিয়ানা থেকে রাজধানী দিল্লী। তাই অগ্রবর্তী ঘাঁটি হিসাবে লুধিয়ানার গুরুত্ব অপরিসীম। লছমন সিং ধারিয়া কিছুক্ষণ একদৃষ্টে চেয়ে রইল দীপ সিংয়ের মুখের দিকে। তার সৈনিক-বুদ্ধি এবং লড়াই সম্বন্ধে মূল্যবান উপদেশ কয়েক মুহূর্তের জন্য লছমন সিংকে নির্বাক করে দিল। তারপর লছমন সিং একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বলল, 'তোমার কথা খুব দামী ভাইয়া কিন্তু কি করব—আমাদের লড়াইয়ের রসদ নাই। আমাদের চলে যেতেই হবে!'

দুর্গ খালি করে ওরা চলে গেল সন্ধ্যার পরে—অন্ধকারের আড়ালে।

পরের কাহিনী, নরকের কাহিনী—ইতিহাসও তার সমগ্র ইতিবৃত্ত লিপিবদ্ধ করতে শিউরে উঠেছে। অন্ধকারের আড়ালে যেমন গা ঢাকা দিয়ে চলে গেল বিদ্রোহী বাহিনী—তেমনি অন্ধকারের আড়ালে গা ঢাকা দিয়ে এগিয়ে আসছিল ফিরিঙ্গীদের বাহিনী দু'দিক থেকে। বাঁ দিকে ফিরোজপুর থেকে—ডান দিকে শতদ্রুর এক আঘাটায় পার হয়ে। ওদের প্রথম ও প্রধান লক্ষ্য লুধিয়ানার বিদ্রোহী-অধিকৃত দুর্গ।

কিন্তু দুর্গ তখন পরিত্যক্ত—সেখানে লড়াইয়ের কেউ নেই। অতএব সবটা আক্রোশ গিয়ে পড়ল প্রথমে লুধিয়ানা শহরের বেয়াদপ মানুষগুলোর ওপরে। ঝাঁপিয়ে পড়ল ফিরিঙ্গী সেনার দল।

রাত তখন দুপুর হবে। অন্ধকার ঘুটঘুটি। গৃহস্থের বন্ধ দরোজায় পড়ল বুটের লাথি। মড় মড় করে ভেঙে পড়তে লাগল দরোজাগুলো। আগুন লাগিয়ে দিলে ভাঙা কাঠকুটোয়। প্রাণ ভয়ে এদিক সেদিক ছুটোছুটি করতে লাগল সবাই। নারী শিশু আর বৃদ্ধের আর্তনাদে ভরে উঠল লুধিয়ানা শহরের আকাশ। তার মধ্যে রাইফেলের শব্দ, কামানের শব্দ। মানুষ মরছে পতঙ্গের মতো।

অন্ধকারে ফেটে পড়ল ইংরাজ কাপ্তেনের ক্রুর কণ্ঠ: 'Teach them—teach them a lesson. এমন শিক্ষা দাও—যাতে আর কোনো দিন শিরদাঁড়া খাড়া না হয়। এমন শিক্ষা দাও যাতে মায়েরা আমাদের কথা ব'লে ঘাবাল

বাচ্চাদের ঘুম পাড়ায়। তারা বড় হলে—তারা আবার তাদের বাচ্চাদের ঘুম পাড়াবে আমাদের কথা বলে।'

শুধু শায়েস্তা হলো না লুধিয়ানার দামাল জোয়ানরা। রুখে দাঁড়াল দীপ সিংয়ের দল এই মৃত্যুর তাণ্ডবের সামনে। ওরা সুকৌশলে ঘিরে ফেলল মারমুখি ফিরিঙ্গীর দলটাকে। ফিরিঙ্গীরা নিরস্ত্র মানুষের নিধন যজ্ঞে তখন মত্ত। এক একটা মানুষ লুটিয়ে পড়ছে আর ওরা আনন্দে পড়ছে ফেটে—হুর্‌ রে।···হঠাৎ অন্ধকারে ওদের ঘাড় লক্ষ্য করে এসে পড়তে লাগল ক্ষুরধার টাঙি, কৃপাণ—বুক লক্ষ্য করে বর্শা। অন্ধকারে কাকে লক্ষ্য করে রাইফেল ছুঁড়বে, বেয়নেট চালাবে ওরা? তাছাড়া ফিরিঙ্গীদের অসুবিধা—তারা পদাতিক আর তাদের ঘিরে ধরেছে যারা তারা ঘোড়-সওয়ার। তবু খ্যাপার মতো অস্ত্র চালাতে লাগল—তাতে মরল নিজেদের মানুষই বেশী, শত্রুও বাদ পড়ল না।

খালসা জোয়ানের দল এক সময়ে ফিরিঙ্গীর দলটাকে নিঃশেষ করে গর্জে উঠল:

'ওয়া গুরুজী কি ফতে।'···

কিন্তু আজ কতজনকে ওরা খতম করবে! ফিরোজপুরের দিক থেকে এবং শতদ্রু বরাবর নৌকো-সেতু বেঁধে দলে দলে ফিরিঙ্গী বাহিনী ঢেউয়ের মতো আছড়ে পড়ছে লুধিয়ানা শহরে। রাস্তাঘাট অলি-গেল ভরে গেল ফিরিঙ্গীর দলে।

তবু, দীপ সিংয়ের দল লড়তে বেরিয়েছিল, মরতে বেরিয়েছিল—ওরা সেই মরার লড়াই লড়ে গেল। দলে দলে ফিরিঙ্গী এসে ওদের ঘিরে ফেলল। রাইফেল আর বেওনেটের সামনে একে একে ওরা নিঃশেষ হয়ে গেল।

লুধিয়ানার পথে পড়ে রইল মৃতদেহের পাহাড়। তার মধ্যে কোথায় রইল দীপ সিংয়ের ঘোড়া আর দীপ সিং—দেবী নিজে এসেও কি খুঁজে বের করতে পারবে তার নিজের হাতে কপালে এঁকে দেওয়া সেই রক্তচন্দনের তিলক দেখে ভাইয়া দীপ সিংকে?

পিম্পল গাঁও

শহরের নরক ছড়িয়ে পড়ল গ্রামে গ্রামান্তরে।

ফিরিঙ্গী সেনার দল শহরকে শায়েস্তা করে উপরওয়ালার হুকুমমতো এবার ছড়িয়ে পড়ল গ্রামে গ্রামে। প্রত্যেকটি কুটির তারা খানাতল্লাসী করে চলল পাতি পাতি করে যদি আগ্নেয়াস্ত্র কিছু থাকে। ঘর থেকে সব টেনে বার করে আগুন লাগিয়ে দিল কুটিরে কুটিরে। জ্বলতে লাগল গ্রামের পর গ্রাম। ধরে নিয়ে গেল সমর্থ মানুষের দলকে। এক এক জায়গায় তাদের জড়ো করে কখনো করলো গুলি—কখনো গলায় ফাঁস এঁটে বড় বড় গাছে দিল ঝুলিয়ে।

বাচ্চারা ভয়ে জড়িয়ে গেল মায়েদের বুকে—মায়েরা ছুটোছুটি করে মরল নিরাপদ আশ্রয়ের সন্ধানে।

আগুনের খবর বাতাসে ছোটে। ক'দিন আগে শহরের মানুষ পালিয়ে এসেছিল গ্রামে—এখন গ্রামের মানুষ পালাতে লাগল যে যেদিকে পারে। আগুন আর মৃত্যুর পাগলা ঘোড়া ছুটিয়ে তেড়ে আসছে ফিরিঙ্গীরা।

পিম্পল গাঁও সন্ত্রস্ত।

মনে মনে ছটফট করতে লাগল ধিয়ান সিং। কোথায় গেল দরবারা, কোথায় গেল তার বার্ধক্যের সহায় সম্বল একমাত্র বেটা দীপ সিং! নিজের বাড়ির মেয়েদের নিয়ে তার ভাবনার অন্ত নেই—তার ওপরে দরবারা সিংয়ের কাজ কারবার ও সংসারের দায়িত্ব নিয়ে সে ছটফট করতে লাগল। ওদিকে গ্রামের পর গ্রাম জ্বালিয়ে

ক্রমশ এগিয়ে আসছে ফিরিঙ্গীরা। আর দেরী না করে নিজের হাতে সে কোদাল ধরল—নিরাপদ জায়গায় গর্ত খুঁড়ে লুকিয়ে ফেলল নিজের এবং দরবারার গম-বাজরা যা ছিল। দরবারার তাঁতশালের মূল্যবান শাল আলোয়ান কাঠের সিন্দুকে ভরে পুঁতে রাখল মাটির তলায়। বলদ গোরু ভেড়াগুলোর সঙ্গে নিজের ঘোড়াটাকেও ছেড়ে দিল প্রান্তরে। তারপর তাঁতঘরে তালা বন্ধ করে বেরিয়ে পড়ল কাচ্চা বাচ্চা নারী পরিজনদের নিয়ে নিরাপদ আশ্রয়ের আশায়।

ছুটে এল গ্রামের মেয়েরা তাদের কাচ্চা বাচ্চা নিয়ে। এল বুড়ো অথর্ব খাল-সারা। ঘিরে ধরল ধিয়ান সিংকে।

মেয়েরা কাঁদতে কাঁদতে বলল, 'বাঁচাও আমাদের—বাঁচাও আমাদের কাচ্চা-বাচ্চাদের খালসাজী। মেয়েদের ইজ্জত বাঁচাও।'

ধিয়ান সিং নিষ্পলক চোখে চেয়ে রইল তাদের দিকে কিছুক্ষণ। গোটা গ্রাম নিয়ে কোথায় যাবে সে? তার স্বভাবসিদ্ধ ধীর শান্ত কণ্ঠে বলল, 'আজ কে বাঁচব জানি না—তবু চলো আমার সঙ্গে। কিন্তু গোরু ঘোড়া ভৈঁসগুলোকে কি মাঠে ছেড়ে দিয়েছ?'

ওরা মাথা নাড়ল।

'এক্ষুনি যাও।' ধিয়ান সিং বলল, 'তোমাদের গম বাজরা পোশাক আশাক মাটিতে পুঁতেছ?'

'তা তো করিনি খালসাজী।'

'তবে তোমরা করছিলে কি?' ধিয়ান খেঁকরে উঠে বলল, 'বসে বসে দেখ-ছিলে—কখন ফিরিঙ্গীরা এসে সব পুড়িয়ে ফেলে!'

সবাই চুপ।

ধিয়ান বলল, 'ও সব পুঁতে ফেলবার আর সময় হবে না। অন্তত অবোধ জানোয়ারগুলোকে মাঠে ছেড়ে দিয়ে এস।'

সবাই ছুটল যে যার ঘরের দিকে।

কিছুক্ষণের মধ্যে দল বেঁধে ফিরে এল সবাই।

ধিয়ান সিং সকলকে নিয়ে এগিয়ে চলল দক্ষিণ মুখো। তার মনে একমাত্র আশ্রয়ের আশা এখন তার ছেলেবেলার দোস্ত জওহর সিংয়ের কোঠা বাড়ি। জও-হর সিংহের মুখেই সে শুনেছে ফিরিঙ্গীদের সঙ্গে তার চেনাজানা আছে। এখন তার আশ্রয়ে গিয়ে পিম্পল গাঁওর হতভাগা এই খালসাদের পরিবারপরিজনকে যদি বাঁচাতে পারে।

ওদিকে তখন উত্তর-পশ্চিম দিক থেকে ছুটে আসছে হিংস্র ফিরিঙ্গী ঘোড়-

সওয়ারের দল। জলছে গ্রামের পর গ্রাম। তাল তাল ধোঁয়া ঘুলিয়ে তুলেছে সারা আকাশ। বাতাসে ভাসছে পোড়া গন্ধ।

ধিয়ান সিংয়ের দল এসে দাঁড়াল জওহর সিংয়ের কোঠার সামনে। দেউড়ি বন্ধ। বরং পড়েছে আজ ডবল খিল।

ধিয়ান সিং দরোজায় ধাক্কা দিয়ে ডাকল, 'দরোজা খোলো।'

কেউ সাড়া দিল না।

সকলে এক সঙ্গে দরোজায় হাত চাপড়াতে লাগল।

কোনো সাড়া পাওয়া গেল না।

ওদিকে তখন আগুন জ্বলে উঠেছে পিম্পল গাঁওর প্রথম কুটিরে। দূর থেকে অল্প অল্প হল্লা শোনা যায় ফিরিঙ্গীদের।

দেউড়ির সামনে সন্ত্রস্ত ভীত কাচ্চাবাচ্চা মেয়ের দল ব্যাকুল হয়ে উঠল।

'ওরা যে এসে পড়ল খালসাজী!'

ধিয়ান সিং চীৎকার করে ডাকতে লাগল, 'জওহর সিং—অজিত—সিং,—কেবল সিং—দরোজাটা খোলো—আমাদের ঢুকতে দাও।'

কেবল সিং—এতদিন যে জওহর সিংয়ের বাড়ি দেখাশোনা করেছে সে এতক্ষণে উত্তর দিল দেউড়ির ভেতর থেকে, 'কেন গোলমাল করছ? দেউড়ি খোলবার হুকুম নাই।'

ক্ষোভে, রাগে, দুঃখে ধিয়ান সিং ঠোঁট কামড়াতে লাগল।

কে বলে উঠল, 'ওই দেখ, ক্রমশ আগুন এগিয়ে আসছে।'

আসছে। ফিরিঙ্গীদের পৈশাচিক উল্লাস স্পষ্ট কানে শোনা যায়। বাতাস ঘুলিয়ে উঠছে ধোঁয়ায়।

এক বুড়ো খালসা খক্‌খক্ করে কাশতে কাশতে বলল, 'দরোয়াজা খুলবে না জওহর সিং?'

'বেইমান।' ধিয়ান সিং দাঁতে দাঁত চেপে গর্জে উঠল। বলল, 'চলো পেছন দিকে, ওদিকে পাঁচিল খানিকটা ভাঙা আছে। ভেতরে আমাদের ঢুকতে হবেই। গা ঢাকা দেওয়ার কোথাও আর জায়গা নেই। চলো—চলো—'

জওহর সিংয়ের কোঠার পর শুধু মাঠ আর মাঠ। একটা গাছ পালা নেই—একটু আড়াল নেই—আবডাল নেই। এতগুলো দলা পাকানো মানুষ এক সঙ্গে পলে ফিরিঙ্গীর রাইফেলের লক্ষ্য সহজতর হবে।

ধিয়ান সিং গোটা দলটাকে নিয়ে চলল সেই ভাঙা পাঁচিলের দিকে। ধসে পড়া কিছুটা অংশ সে নিজেই লোকজন দিয়ে ইটের পর ইট সাজিয়ে সেদিন মাত্র

ঘিরে দিয়ে গিয়েছে। চটপট সেগুলো সকলে হাতে হাতে সরিয়ে কিছুটা পথ করে নিল। মেয়েদের এবং বাচ্চাদের আগে পাঁচিলের ভেতরে চালান করে দিলে। সব শেষে বৃদ্ধ অক্ষম সর্দারজীর দল। ভেতরে ঢুকে আবার হাতে হাতে ইটগুলো যেমন পাঁচিল বরাবর সাজানো ছিল—তেমনি সাজিয়ে দিলে।

জওহর সিংদের বেশ বড় চকমিলান বাড়ি। বাড়ির পেছনে ঢেঁকিশাল, গোয়াল। সবই ছিল ইটের গাঁথুনি—পাকা ব্যবস্থা। আজ ঢেঁকিও নেই, গোরুও নেই। ওদিকটা পোড়ো বাড়ির মতো পড়ে আছে—সেদিন ধিয়ান সিং সাফ করতে এসে দেখে গেছে। ব্যবহারে লাগবে না বলে ওটা আর পরিষ্কার করেনি। ওই ঢেঁকিশাল আর গোয়ালের মধ্যে মেয়েদের আর বাচ্চাদের আগে ঢুকিয়ে দিল—তারপর বয়োবৃদ্ধ সর্দারজীরা। বাচ্চারা ভয়ে জড়িয়ে গেছে মায়েদের গায়ে। কিশোরেরা চোখ বড় বড় করে তাকিয়ে আছে বাইরে—পরে কি ঘটবে যেন তাই দেখবার জন্য তাদের পরম আগ্রহ। অপেক্ষা করছে সবাই রুদ্ধ নিঃশ্বাসে—মুখে একটু সাড়া নেই, শব্দ নেই।

শুধু এক বুড়ো সর্দারজী মাঝে মাঝে এখনও কেশে উঠছে।

ধিয়ান সিং দাঁড়িয়ে আছে, দরোজা আগলে। চাপা গলায় ধমকে উঠল, 'চুপ!'

কাশি চাপতে চাপতে বুড়ো সর্দারজী খস্‌খসে গলায় বলে উঠল, 'দেখছ না, ধোঁয়া—আমাদের ঘর-পোড়া ধোঁয়া আমাদের গম বাজরা পোড়ার গন্ধ!—গুরু –'

'চুপ্‌!'

ফিরিঙ্গী সেনাদের হাঁক ডাক—হল্লা, এগিয়ে আসছে। এগিয়ে আসছে। এগিয়ে আসছে দ্রুত ধাবমান অনেকগুলো ঘোড়ার পায়ের শব্দ।

'হে—'

'এ কোঠি—'

দমাদম সবুট লাথির শব্দ। এবার জওহর সিংয়ের দেউড়িতে।

'আডমি লোগ হিঁয়াই মালুম—'

'টোড়ো দরোয়াজা—'

ভেতর থেকে দেবী ডাকল চাপা গলায়, 'বাবা তুমি ভেতরে ঢোকো।'

ধিয়ান সিং কোনো কথা বলল না—একবার ফিরেও তাকাল না। ভাঙা দরোজায় তেমনি পিঠ ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে রইল পাথরের মতো।

'ওদিকে দেউড়িতে লাথি পড়ছে সমানে। বোধ করি দেউড়ির দরোজা এবার ভেঙে পড়ে।

কাঁপতে কাঁপতে এগিয়ে গেল জওহর সিংয়ের ছেলে অজিত সিং—হাতে একটা গোল করে গোটানো কাগজ। কামিন কেবল সিংকে দরোজা খুলতে বলল। বেচারী কেবল সিং কাঁপতে কাঁপতে দরোজা খুলে দিল। অজিত সিং মিলিটারী কেতা বোঝে—সঙ্গে সঙ্গে আত্মসমর্পণের ভঙ্গীতে দু'হাত তুলে দাঁড়াল। মাথা নুইয়ে অভিবাদন করল।

ফিরিঙ্গীদের রাইফেল পিস্তল তাকে বিদ্ধ করবার জন্য উদ্যত।

'আমি লুধিয়ানা ফোর্টের রসদদার।'

'রসদদার!—কৌন্?'

এক ফিরিঙ্গী হেঁকে উঠল, 'ভাগটা—সোয়াইন—'

রাইফেল গর্জে উঠল ফিরিঙ্গীর। কেবল সিং পালাচ্ছিল—আর্তনাদ করে মুখ থুবড়ে পড়ল। দু-একবার ছটফট করতে করতে স্থির হয়ে গেল।

অজিত সিং হাতের কাগজটা এক ফিরিঙ্গীর দিকে এগিয়ে দিয়ে কম্পিত গলায় বলল, 'কাপ্তেন সাহাবকা ইয়ে পাঞ্জা দেখিয়ে।—'

ফিরিঙ্গীটা কোন্ ক্যাপ্টেনের দস্তখৎ করা দুর্গের ভেতরে ঢোকার অনুমতি পত্র উল্টে পাল্টে কয়েকবার দেখল। তারপর বলল, 'টোম রিবেল নেহি?'

অজিত সিং লম্বা সেলাম ঠুকে বলে উঠল, 'আপকো নোকর হ্যায় সাহেব। বহুৎ রোজের রসদদার আছি।'

ফিরিঙ্গী সৈনিক শুধালো, 'গাঁওকা আড্‌মি লোগ কাঁহা?'

অজিত সিং কিছুমাত্র দ্বিধা না করে বাড়ির পেছন দিকে দেখিয়ে দিল। অজিত সিং জানালা দিয়ে দেখেছে ধিয়ান সিংয়ের কাণ্ড।

ঘোড়াসওয়ারের দল এগিয়ে গেল পেছন দিকে।

গোয়াল ঘরের ভাঙা দরোজার সামনে তখনো এক ভাবে পাথরের মূর্তির মত দাঁড়িয়ে আছে ধিয়ান সিং। পিম্পল গাঁওর শেষ অতন্দ্র প্রহরী দীর্ঘদেহী শিখ—মাথায় সাদা পাগড়ী, ক'দিনের দুশ্চিন্তায় দাড়ির সমস্ত চুল হয়ে গেছে সাদা। ফিরিঙ্গী ঘোড়সওয়াররা এগিয়ে গেল তার দিকে। পাথরের মতো কঠিন ঠাণ্ডা চোখে ধিয়ান সিং তাকাল সামনের ফিরিঙ্গীটার দিকে।

কি জানি কেন, সামনের ফিরিঙ্গী সৈনিকটি হঠাৎ যেন থমকে গেল। বোধ করি ওই দীর্ঘকায় ঋজুদেহ বয়োবৃদ্ধ মানুষটার গোটা চেহারাটার মধ্যে সম্ভ্রম আকর্ষণ করার মতো যথেষ্ট কিছু ছিল।

ফিরিঙ্গী জিজ্ঞেস করল, 'টোম কোন হ্যায়

ধিয়ান সিং ঠাণ্ডা মাথায় জবাব দিল, 'অজিত সিংয়ের বাবা জওহর সিংয়ের দোস্ত।'

গোয়াল ঘরের ভেতরে আঙুল দেখিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'রিবেল হ্যায় ?'

ধিয়ান সিং নীরবে মাথা নেড়ে অস্বীকার করল।

পেছন থেকে আর একজন উদ্ধত ফিরিঙ্গী সৈনিক ঠেলে এগিয়ে গেল—বলল, 'ডেখেগা।'

'নেহি।' হঠাৎ ধিয়ান সিং গর্জে উঠল, 'ইয়ে হামার ইজ্জৎ।'

'সোয়াইনকা ইজ্জৎ! হটো!'—উদ্ধত ফিরিঙ্গী ঘোড়ার ওপর থেকেই ধিয়ান সিংকে লাথি মেরে সরিয়ে এগোতে গেল। চোখে আগুন যেন ধক্ করে জ্বলে উঠল ধিয়ান সিংয়ের। ধস্তাধস্তিতে তার মাথার পাগড়ি গেল খুলে। ফিরিঙ্গী সৈনিক ওর ঝুঁটি চেপে ধরল। ঝাঁকানি দিতে দিতে দাঁতে দাঁত চেপে সাপের মতো হিসিয়ে উঠল—'বুঢ্ঢা রিবেল!'

খালসা শিখের ঝুঁটি—তার ধর্ম—তার ব্রতের নিদর্শন। গুরু গোবিন্দের পবিত্র এক শপথ বহন করছে ওরা ওই ঝুঁটিতে। ক্রোধে অপমানে ধিয়ান সিং আত্মহারা হয়ে গেল। ঘোড়সওয়ার ফিরিঙ্গীরা ঘিরে ধরলো ধিয়ানকে। কে একজন বলে উঠল, 'হ্যাং হিম—ফাঁস লাগাও!'

ধিয়ানের ঝুঁটি ধরে ঘোড়সওয়ার ফিরিঙ্গী ক'জন টানতেটানতে নিয়ে চলল দেউড়ির দিকে। একজন ফিরিঙ্গী ঘোড়া থেকে নেমে পিস্তল উঁচিয়ে সন্তর্পণে উঁকি মারল গোয়াল ঘরের ভেতরে। সহসা নানা কণ্ঠের একটা দলা পাকানো আর্তনাদ ফেটে পড়ল ঘরের ভেতরে। ফিরিঙ্গীটা চারদিকে চোখ চালিয়ে দেখল—বাচ্চাদের ঘিরে বসে আছে মেয়েরা, মেয়েদের আগলে বসে আছে আরও অনেক বুড়ো। বাচ্চা আর মেয়েদের ভয় পাওয়া আর্তনাদে ফিরিঙ্গীটা অট্টহাসি হেসে উঠল। ফিরে এসে ঘোড়ায় চেপে বলল, 'নো রিবেল।—সব শুয়োরের বাচ্চা আউর মাদী আছে, বুঢ্ঢা আছে। উও বুঢ্ঢা রিবেলটা কোথায় ?'

বুঢ্ঢা রিবেল তখন চিৎপাত হয়ে পড়ে আছে কেবল সিংহের পাশে। বুকে আমূল বসানো ধিয়ান সিংয়ের নিজেরই ছোরা। তার চুলের ঝুঁটি ধরে ফিরিঙ্গীটা যখন টেনে হিঁচড়ে আনছিল দেউড়ির দিকে—তখনই সে তার শেষ কাজ নিজেই শেষ করে গেছে। হাত দুটো মুক্তই ছিল আর কোমরে ছিল ছোরা। ফিরিঙ্গীর মৃত্যুদণ্ড সে এড়িয়ে গেছে।

তবু ফিরিঙ্গীরা পিম্পল গাঁও ছেড়ে যাওয়ার আগে গ্রামের সবচেয়ে বুড়ো পিপুল গাছের ডালে ফাঁসীতে লটকে দিয়ে গেল দুটো লাশ। উপরওয়ালার নির্দেশ :

'বিদ্রোহী লুধিয়ানাকে উচিত শিক্ষা দাও। নো মার্সি।' কোনো দয়ামায়া নয়।

যাওয়ার সময় খালসাদের মাঠে ছাড়া যে কটা ঘোড়া ছিল সব ধরে নিয়ে গেল। খালসাদের টগবগে ঘোড়ার ওপর ওদের বড় লোভ। লড়াইয়ে ওই ওদের লুণ্ঠনের ভাগ। এ গরীব খালসা গ্রামে লুঠ করে নিয়ে যাওয়ার মতো আর কিছু মূল্যবান ছিল না। রঞ্জিৎ সিংহের দিন গেছে—দিন গেছে খালসাদের বোল -বোলাওয়ের।

জওহর সিংয়ের বাড়ি থেকে এসে ভস্মসাৎ কুঁড়েগুলোর সামনে কাচ্চাবাচ্চা আগলে বসে রইল মেয়েরা আর বুড়োরা। কোথাও কোথাও তখনো যেন চুইয়ে চুইয়ে ধোঁয়া উঠছে। একদানা খাবার পড়ল না সারাদিন ওদের পেটে। বাচ্চাগুলো যেন কাঁদতেও ভুলে গেল। দিন শেষ হলো এমনি ভাবে। মাঠে ছাড়া গরুবলদ ভৈঁসগুলো ফিরে এল একে একে। তারা ঘর খুঁজে পেল না, গোয়াল খুঁজে পেল না। ওই বোবা মানুষগুলোর পাশে এসে ওদের মতোই পোড়া ছাইয়ের স্তূপের দিকে চেয়ে রইল ফ্যাল ফ্যাল করে।

সারা পিম্পল গাঁও ভস্মস্তূপ—তার মধ্যে বড় স্তূপ দরবারা সিংহের। তার বড় বাস্তুভিটে ছিল, তাঁতশাল ছিল, ছিল গালিচার কারখানা। সেই বিরাট ভস্মস্তূপের মুখোমুখি হাঁটু মুড়ে বসেছিল দরবারা সিংয়ের স্ত্রী রূপান আর পুত্রবধূ দেবী। দেবীর বাচ্চা দুটো মায়ের কোলে মাথা দিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে—না পড়ে আছে ভয়ে আচ্ছন্নের মতো, কে জানে। আগুন আর মৃত্যুর বিভীষিকা ওদের সকলের জ্ঞান বুদ্ধি যেন আচ্ছন্ন করে দিয়ে গেছে। কথা বলছে না কেউ, অভিসম্পাত দিচ্ছে না কেউ, কাঁদছে না কেউ।

রাতের অন্ধকারে আবার ক'জন অশ্বারোহী এসে থামল হতভাগা মানুষগুলোর মহল্লায়। কে একজন ঘোড়া থেকে নেমে ঠাউরে ঠাউরে এগিয়ে গেল দরবারা সিংয়ের বাড়ির দিকে। দাঁড়াল এসে ভস্মস্তূপের সামনে। অন্ধকারে সে কারুকেই দেখতে পেল না। দেখতে পেয়েছে অবশ্য দেবী কাউর। ভয়ে ভাবনায় সে যেমন বসেছিল এক গাছের তলায়, তেমনি বসে রইল।

আগন্তুক বলে উঠল, 'কে আছ! রূপান কাউর, দেবী কাউর!—তোমরা কোথায়?'

গলাটা যেন চেনা মনে হয়। তবু ওদের গলা দিয়ে একটা শব্দ বেরুল না। গলার ভেতরটা যেন শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে। রূপান কাউর হাঁটুতে মুখ গুঁজে বসে আছে এক ভাবে।

আগন্তুক কোনো সাড়া শব্দ না পেয়ে আবার বলে উঠল, 'আমি নারায়ণ সিং —ভাইনী আশ্রম থেকে গুরু রাম সিংয়ের আদেশ নিয়ে এসেছি। ভয় নেই— তোমরা কোথায়, কথা বলো।'

এ সেই বিহঙ্গম নারায়ণ সিং—কুকা ব্রতচারী। একে ভাল করেই চেনে রূপান আর দেবী দু'জনেই। দরবারা সিংয়ের সঙ্গে দেখা করতে বেশ কয়েকবার এসে গেছে এ গাঁয়ে। কিন্তু রূপান কাউর সাড়াও দিল না, নড়লও না। দেবী গাছতলার অন্ধকার আড়াল থেকে বেরিয়ে এসে প্রণাম করল নারায়ণ সিংকে। পা ছুঁয়ে প্রণাম করতে গিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল।

নারায়ণ সিং সান্ত্বনা দিয়ে বলল, 'কাঁদিসনে বেটি—তোর মনকে আজ শক্ত কর। তামাম লুধিয়ানার আজ এই হাল। আশ্রম বলে আমাদের ভাইনীর সুবা শুধু বেঁচে গেছে। তোকে সেখানে নিয়ে যাওয়ার জন্য গুরু আমাকে পাঠিয়ে দিয়েছেন। এখনি রওয়ানা হতে হবে।'

'এ জায়গা ছেড়ে আমি কেমন করে যাব! আমার বাবাকে শয়তানরা' —কথা বেধে গেল গলায়, কান্নায় ভেঙে পড়ল দেবী।

নারায়ণ সিং বলল, 'আমি সব শুনেছি বেটি। আমরা তাঁর সৎকার করবো —ভাবিস না। আমাদের লোকজন সব এসে গেছে—তারাই সব ব্যবস্থা করবে। এখানে তোর এক দণ্ডও আর থাকা চলবে না। লুঠেরা ফিরিঙ্গীরা এখন গ্রামে গ্রামে বার বার হানা দিচ্ছে! রূপান কাউর কোথায়? তাকেও সঙ্গে নিয়ে যাওয়ার আদেশ আছে।'

দেবী অন্ধকার একটা গাছতলা দেখিয়ে দিলে।

কিন্তু রূপান কাউর অনড়। গাছতলায় যেমন সে বসেছিল তেমনি বসে রইল। ভাল করে কথাও বলল না। শুধু বলল, 'আমি এইখানে মরবো। আমার সর্দারজী না এলে আমি একপাও নড়বো না। দেবী তার দুটো বাচ্চাকে নিয়ে চলে যাক।'

নারায়ণ সিং বলল, 'আমাদের আশ্রমে কত খালসার মা-বহিন জরু বেটি আছে, তোমাদের গাঁ থেকেও কতজন যাবে। তোমার আপত্তি কি?'

রূপান কাউর কঠিন গলায় শুধু বলল, 'নেহী—মেরে ভিটা নেহী ছোড়েঙ্গী। সর্দার আসুক।'

নারায়ণ সিং ভারি মুস্কিলে পড়ে গেল। অন্যান্য কুকা ব্রতচারীদের সঙ্গে পরামর্শ করে শেষ পর্যন্ত সে দেবী আর তার দুই বাচ্চাকে ঘোড়ায় চাপিয়ে সেই রাতেই রওয়ানা হয়ে গেল ভাইনীর দিকে। কুকা ব্রতচারীর দল লেগে গেল গাঁয়ের ভীত

অভুক্ত মানুষগুলোর পরিচর্যায়। ওদের আশ্রমের লঙ্গরখানা থেকে এনেছিল বাজরার খই, জোয়ারের চাপাটি—সেগুলো বিলোতে লাগল সকলের মধ্যে। কিন্তু রূপান কাউর দাঁতে কাটল না একটা টুকরোও। তেমনি বসে রইল গাছ-তলায়—পাগলীর মতো। মাথার চুলগুলো আলুথালু—উড়ছে বাতাসে। ডাগর ডাগর চোখ দুটো কেমন যেন আরও বিস্ফারিত। কখন বোধকরি পোড়া ভিটের ছাই দমকা হাওয়ায় উড়ে এসে পড়েছে মাথায়, মুখে—সর্বাঙ্গে। কারুর সঙ্গে কথা বলে না। মাঝে মাঝে ঠোঁট দুটো শুধু নড়ে। সবটা মিলে সে কেমন অস্বাভাবিক।

লুধিয়ানার লড়াইয়ে মৃত খালসাদের জরু বেটি বহিনদের নিয়ে চলে গেল কুকা ব্রতচারীর দল ভাইনীর দিকে। রাত তখন শেষ হয় হয়। রূপান কাউর তার স্বামীর ভস্মীভূত ভিটের দিকে মুখ করে গাছতলায় বসে বসে ঢুলছিল। ভোরের দিকে ঘুমন্ত মানুষটার কানে কোথা থেকে যেন ভেসে এল এক অতি পরিচিত শব্দ।

চিঁ···হিঁ···হিঁ···

চমকে জেগে উঠল রূপান কাউর। এ কী স্বপ্ন!···

স্বপ্ন নয়—সত্যি। বিদ্যুৎ বেগে ছুটে আসছে তুফান মাঠপ্রান্তর ভেঙে, কোথায় কোন বনবাদাড় অরণ্য পাহাড় ভেঙে। অবশেষে তার পরিচিত গ্রাম—তারপর গ্রামপথ। কিন্তু সেই যে জমজমাট একটা গ্রাম ছিল—একটা ঘর ছিল—সেটা কই! ··· আবার চিৎকার করে উঠল : চিঁ ··· হিঁ ··· হিঁ

কোথায়—কোথায় সেই সমৃদ্ধ গ্রাম—কোথায় সেই সচ্ছল ঘর-বসত! এ যে কেবল ছাই ভস্মের স্তূপ। ছুটতে লাগল থম্‌কে থম্‌কে পথে বিপথে।

রূপান কাউর ধড়মড়িয়ে উঠে চিৎকার করে ডেকে উঠল, তুফা···ন তুফা···ন এই যে আমি! তুফান!'···

তুফান ছুটে এল ডাক শুনে। কিন্তু, নেই—ওপরে তার সওয়ার নেই। আজ সে সওয়ারহীন। ঘামে নেয়ে উঠেছে তার সারা অঙ্গ। দলা দলা রক্ত জমে আছে গায়ে—শুকিয়ে গিয়েছিল, তার ঘামে আবার ভিজে দগ দগ করছে।

রূপান কাউরের গা ঘেঁষে এসে দাঁড়াল তুফান কিন্তু কেমন চঞ্চল, পা ঠুকছে, যেন এখুনি আবার ছুটবে।

রূপান তার গলা জড়িয়ে ধরে চিৎকার করে কেঁদে উঠল, 'বোল্ ··· বোল্ বেটা ··· তোর সওয়ার কোথায়। বোল্—কোথায় রেখে এলি তাকে।···'

ঝপ্ ঝপ্ করে চোখের পাতা পড়তে লাগল তুফানের।

হঠাৎ তার কান দুটো খাড়া হয়ে উঠল। ঘাড়ের কেশর উঠল ফুলে।

আবার কোথায় খটাখট শব্দ উঠছে ঘোড়ার খুরের। পশুর সজাগ ইন্দ্রিয় শুনতে পেয়েছে। হ্যাঁ আসছে—ছুটে আসছে দুজন ফিরিঙ্গী লুঠেরা। হাতে ঘোড়া ধরা লাস।

একজন তুফানকে দেখে হেঁকে উঠল, 'হে ··· দেয়ার ··· ইউ সী।'

তুফান মুহূর্তে মুখ ঘুরিয়ে ছুটল আবার।

'সোয়াইন !'—আর একটা ফিরিঙ্গী গালাগাল দিয়ে বলে উঠল 'আনম্যানেজে-ব্‌ল্ লাইক হিজ মাস্টার—সোয়াইন মালিক্‌কা মাফিক বহুৎ বেতরিবৎ হ্যায়।'

হ্যাঁ, যেমন সওয়ার, তেমনি ঘোড়া ! ফিরিঙ্গীর বন্ধন মানে না। বড় পেয়ারের ঘোড়া দরবারার—বহুৎ তালিম পাওয়া।

লুঠেরারা তবু দমল না। হেঁকে বলল, 'পাকড়ো।'···

পঞ্জাব সিং

'আসছে—আসছে, আবার আসছে—পালাও—পালাও। ...'

পোড়া ভিটার ওপরে গাছের ডালপালা ঘাসপাতা দিয়ে কোনো রকমে সব এক একটা ঝুপড়ি টঙ তৈরী করে মাথা গুঁজেছিল অসহায় পিম্পল গাঁওর মানুষ। ক'দিন যেতে না যেতে আবার একদিন দেখতে পেল—রুখা প্রান্তরে উড়ছে ঘোড়ার পায়ের ধূলো। দূর থেকে দেখা যাচ্ছে এক-একটা কালো বিন্দুর মতো।

কিন্তু পালাবে কোথায়? আজ ওদের পালিয়ে বাঁচবারও জায়গা নেই। জওহর সিংয়ের বাড়িমুখো আর ওদের পা উঠল না।

বুড়োরা ঘোলাটে চোখে তাকিয়ে রইল প্রান্তরের দিকে। কে একজন বিড় বিড় করে বলল, 'আমাদের তো আর পড়নেওয়ালা জোয়ান একটাও বেঁচে নেই!'

কয়েকটা কিশোর গাঁয়ের বড় পিপুল গাছে উঠে চোখ চালিয়ে দেখছিল। ওদের একজন বলল, 'ঘোড়া নয়—পাহাড়ী খচ্চর।'

পাহাড়ী খচ্চরে চেপে আসছে এবার মিশনারী পাদ্রীর দল। সকলের সামনে বুড়ো মতো এক পাদ্রী—তার পেছনে মধ্যবয়সী একজন ক্রুশবাহী, কাঁধে তার ছোটখাট একটা ক্রুশ। দু'খানা কাঠের ওই তাজ্জব বস্তুটার দিকে চোখ পড়তেই সকলে আরও ঘাবড়ে গেল। না জানি ওটা আবার কি অস্ত্র! ওরা ফিরিঙ্গীদের দৌলতে রাইফেল দেখেছে, পিস্তল দেখেছে, বেয়োনেট দেখেছে, কামান দেখেছে—এ পর্যন্ত ওটা দেখেনি। তার কারণ, লুধিয়ানা শহরকেই কেন্দ্র করে আশ-পাশের শহরতলির গাঁয়ে এতদিন মিশনারীরা ওদের ধর্মের মাহাত্ম্য কীর্তন করে বেড়িয়েছে। এবার সব পাপীতাপীদের উদ্ধারের জন্য ঢুকে পড়েছে গভীর গ্রামে। কিন্তু পিম্পল গাঁওর কাচ্চাবাচ্চা মেয়ে বুড়ো ভয়ে ছুটতে লাগল উল্টো মুখো।

বুড়ো পাদ্রী দু'হাত তুলে ওদের থামতে বলল, 'ভয় পাইয়ো না—দাঁড়াও।

সদা প্রভুর নির্দেশে তোমাদের উদ্ধারের জন্য আমরা আসিয়াছি। ডরো মৎ ভাইয়ো অওর বেহ্নো। …'

ওদের দলে জনা-দুই পঞ্জাবীও আছে। তারা ছুটে গিয়ে পিম্পল গাঁওর ভয় পাওয়া মানুষগুলোকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে ডেকে আনল। জড়ো করল সেই বুড়ো পিপুল গাছের তলায়।

বুড়ো পাদ্রী অনেকক্ষণ ধরে ধর্মের মাহাত্ম্য, ওদের সদা প্রভুর অলৌকিক জীবন ও নির্দেশের কথা শোনাল। বলল, 'একমাত্র আমরাই টোমাদের উড্ঢার করিটে পারে। আমাদের অনুসরণ করো—গীর্জায় আইস। টোমাদের খাদ্য দিব, টোমাদের বসন দিব, ভাল ভাল পিরান দিব।' তারপর সহযোগীদের দিকে তাকিয়ে বলল, 'দাও—উহাদের এখনই কিছু দিয়া দাও।'

খচ্চরের পিঠে মোট-বন্দি সব প্রস্তুত ছিল। একজন মোট খুলে ওদের কয়েক প্রস্ত পোশাক তুলে দিল হাতে হাতে—একজন বিলোতে লাগল পাঁউরুটি। তারপর এ গাঁয়ের প্রচার কাজ সেরে প্রান্তর ভেঙে চলল আর এক গাঁয়ে।

পিম্পল গাঁওর মানুষ ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে রইল ওদের দিকে।

মেয়েদের হাতে এক-একখানা পাঁউরুটি গুঁজে দিয়ে গেছে। সেটাকে ওরা বহুক্ষণ নাড়াচাড়া করে দেখল। টিপে দেখল—নরম নরম। শুঁকে দেখল—কেমন ম'দো ম'দো গন্ধ। তাজ্জব চিজ!

বুড়োদের মধ্যে প্রাচীন খালসা সৈনিক আছে। লাহোর অমৃতসরে তাদের কেটেছে বহুদিন। তারা পরম অভিজ্ঞের মত বলল, 'ফেরেঙ্গী রোটি।'

মেয়েরা বলল, 'এত নরম কেন?'

আর একজন বলল, 'কিসের গন্ধ যেন!'

এক প্রাচীন খালসা ফিস্ ফিস্ করে বলল, 'বোধহয় গোমাংসের রস আছে। ওরা আমাদের জাত নিতে চায়! হুঁশিয়ার।'

সকলের হাত থেকে ঝপ্ ঝপ্ খসে পড়ল রুটিগুলো।

না, কেউ আর সে রুটির দিকে ফিরেও তাকাল না।

এক বুড়ী বলে উঠল, 'বেঁচে থাক আমাদের ধিয়ান সিংয়ের বেটি। সে আমাদের যে গম বাজরা দিয়ে গেছে তাতেই আমরা কোনো রকমে বেঁচে যাব। ও শুধু নামে দেবী নয়—আস্লি দেবী।'

যাওয়ার সময় দেবী মাটির তলায় লুকিয়ে রাখা বাপের আর শ্বশুরের সব গম বাজরার সন্ধান দিয়ে গেছে প্রাচীন খালসাদের কাছে—বিলিয়ে দিয়ে গেছে।

কিন্তু তাতেও সারা পিম্পলগাঁওর চলবে কতদিন? একবেলা করে খেলে

বড়জোর চার-পাঁচ মাস। তারপর? বুড়ো খালসারা এক জায়গায় জড়ো হয়ে বিড় বিড় ক'রে হিসাব করে। মেয়েরা চেয়ে থাকে শূন্য চোখে। তারপর বিদ্রোহী লুধিয়ানার গ্রাম গ্রামান্তরের মানুষের যে হাল হবে—ওদেরও হবে তাই। ওদের জোয়ানেরা মরেছে, ওদের ঘর পুড়ে ছাই হয়ে গেছে—তার সঙ্গে সঙ্গে গেছে সারা বছরের সম্বল। বিদ্রোহের পরে বিদ্রোহী লুধিয়ানার গ্রামগুলো ধুঁকছে।

লাহোরে তখন উৎসবের রোশনাই। ফিরিঙ্গীরা মাতোয়ারা। পঞ্জাবকে সম্পূর্ণ বিদ্রোহী-মুক্ত করতে পেরেছে—এতে ওদের আনন্দ হওয়ারই কথা। এই দেশ—এই দেশের মানুষগুলোকে নিয়ে ইংরেজের দুশ্চিন্তা ছিল অনেক। সৈনিকের জাত—কখন কি করে বসে! তাই এখানে শাসনভার দিয়েছে বাছা বাছা কুট-কৌশলী ইংরেজের হাতে। তারা এ-জাতের দুর্বল স্থান খুঁজে খুঁজে লাগিয়ে দিয়েছে ভেদনীতির ভেল্কি। বেঙ্গল আর্মি আর গোর্খালী বাহিনী দিয়ে পঞ্জাব অধিকার করেছে, সিপাহী বিদ্রোহের সময় আবার পুরবিয়া বেঙ্গল আর্মির বিরুদ্ধে পঞ্জাবীদের উস্‌কে দিয়েছে, মুসলমানের বিরুদ্ধে শিখকে লাগিয়েছে, শিখের বিরুদ্ধে গুর্খাকে লাগিয়েছে শিখকেও লাগিয়েছে। একেবারে বারো রাজপুত—তের হাঁড়ি।

এরই মধ্যে সগৌরবে সামরিক অভিবাদন গ্রহণ করল পঞ্জাবের ছোট লাট—রণজিৎ সিংয়ের লাহোর দরবারে বসল ইংরেজের বিজয় দরবার। সারা পঞ্জাব থেকে এসে জড়ো হলো অফিসারের দল—ভেট নিয়ে হাজির হলো করদ্-রাজ্য ঝিন্দ নাভা পাতিয়ালার রাজা উজীর। আমন্ত্রিত হয়ে এল লাহোর অমৃতসরের উঁচু-তলার মানুষ—মোহান্ত, জমিদার সর্দারের দল। বিতরিত হলো অনেক পুরস্কার—অনেক উপাধি খেলাত, বাহিনীতে বাহিনীতে নতুন নতুন পদাধিকার। ভোজ্য পানীয়ের ঢালাও ব্যবস্থা সেদিন। ইংরেজ শাসনের প্রধান কেন্দ্র লাহোর উৎসবে উচ্ছল, আনন্দে মাতোয়ারা।

সুখ নেই শুধু পঞ্জাব সিংয়ের মনে। লোকটা সেদিন সব কিছু যেন এড়িয়ে এড়িয়ে চলছে। আজ ছুটি। বাহিনীর কুচকাওয়াজ নেই। নিয়ম শৃঙ্খলার কড়াকড়ি নেই। সবাই প্রায় আজ দুর্গের বাইরে। শুধু সে ছাড়া। চুপচাপ বসেছিল নিজের ব্যারাকে। তাকে এসে পাকড়াও করলে পাহারা সিং। বলল, 'সেই সকালে দরবার থেকে তোমাকে লক্ষ্য করছি। উপাধি পুরস্কার ঘোষণার পর থেকেই দেখছি তুমি যেন কেমন গম্ভীর হয়ে গেছ।'

'তোমার অনুমান ঠিক নয়।' এ কথা বলল বটে পঞ্জাব সিং কিন্তু তার মুখ চোখ কেমন ফ্যাকাসে হয়ে উঠল। যেন কোন-কিছু ব্যাপারে ধরা পড়ে গেছে।

'হয়তো নয়—হয়তো আমার ভুল। তবে ব্রহ্মদেও গুরং—ওই খুনে গুর্খাটা এই মওকায় সুবাদার হয়ে গেল, আর তুমি যা ছিলে তাই থেকে গেলে—এ কথাটা তো খাঁটি।' —বলে পঞ্জাবের দিকে তীব্র দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল পাহারা সিং। তারপর হেসে বলল, 'আমার কাছে চেপে কি হবে দোস্ত—আমি সব বুঝি।'

পঞ্জাব বলল, 'আমি লুধিয়ানায় যাইনি—ও গেছে, সেখানে শুনেছি নরক তৈরী করেছে। ও তার পুরস্কার পেয়েছে।'

'জানি। তোমাকে কেন পাঠানো হয়নি—তাও জানি। কাপ্তেন তোমাকে বিশ্বাস করে পাঠাতে পারেনি। তুমি লুধিয়ানার লোক, তুমি খালসা।'

নিচের মানুষ উপরে উঠে গেলে যে ক্ষোভ হয়, সেই ক্ষোভ পঞ্জাব সিংয়ের। শুধু ক্ষোভ নয়—বিদ্বেষ, আত্মধিক্কার, ঘৃণা—সব যেন ঘুলিয়ে উঠছে তার মধ্যে। পঞ্জাব সক্ষোভে বলল, 'ওরা আমাকে বিশ্বাস করেনি। এটা ঠিক, ব্রহ্মদেও ওখানে গিয়ে যা করেছে আমি তা পারতাম না। তবু আমি কি না করেছি পাহারা!...' হঠাৎ আবেগে পঞ্জাব সিংয়ের হৃদয়ের দুয়ার যেন খুলে গেল। বলল, 'খালসা বাহিনীর সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছি, বাপের সঙ্গে বিরোধ করেছি, ঘর ছেড়েছি, জরু বেটা মা—সব ছেড়েছি। সব ভুলেছি। নিজের ধর্ম পর্যন্ত দিয়েছি—খিরিস্তান হয়েছি। আর কি চাই!'

পাহারা বলল, 'চলো—বাইরে ঘুরে আসি। মন খারাপ ক'রো না, ওঠো।' পাহারা উঠে দাঁড়াল।

পঞ্জাব তার একটা হাত চেপে ধরে বলল, 'আমাকে খুন করতে পারো পাহারা? গুলি করে মেরে ফেলতে পারো?'

এ সেই জাঠের হঠাৎ বিস্ফোরিত আবেগ—হঠাৎ নামা পাহাড়ী বন্যার মতো। রাঙা—ঘোলাটে—ভয়ঙ্কর!

পরের দিন দেখা গেল—ছুটি নিয়ে পঞ্জাব সিং তার সাদা রঙের ঘোড়া বিজ্‌লীকে ছুটিয়ে দিয়েছে পিম্পল গাঁওর দিকে। শতদ্রু পার হয়ে দক্ষিণে লুধিয়ানা—তার জেলা।

দেখতে দেখতে চলল ভস্মীভূত গ্রামের পর গ্রাম। ছুতোর কামার কিষাণ খালসা—কারুর একটা ঘরও মাথা তুলে দাঁড়িয়ে নেই। সব কোনো রকমে মাথা গোঁজার মতো এক-একটা ঝুপড়ি টঙ। যেন হামাগুড়ি দিয়ে কোনও রকমে মাটি কামড়ে পড়ে আছে। বহু দিনের পরিচিত মহল্লাগুলো সে চিনতে পারল না। গ্রামগুলো ভুল হয়ে গেল। নিজের গাঁয়ে ঢুকে গাঁ খুঁজে পেল না। এ সেই

তুফানের মতো। তবু তুফানের নাম ধরে ডেকেছিল তার মা রূপান কাউর। কিন্তু তার নাম ধরে আজ কেউ ডাকলও না।

সন্ধ্যে তখন উৎরে গেছে। রাত অন্ধকার। ভাল ক'রে ঠাওর হয় না। তারই মধ্যে ঠাউরে ঠাউরে কতগুলো ঝুপড়ি টঙের কাছে গিয়ে সে দাঁড়াল। ডাকতে গিয়ে সে থমকে গেল। কাকে ডাকবে? কে আছে এখানে—সে জানে না। তার মনে হলো—এ যেন কতগুলো পাহাড়ী ভবঘুরের ঝুপড়ি। নতুন এসে আস্তানা গেড়েছে—কাল বা পরশু চলে যাবে। এরা কি জানে পিপ্পল গাওর খবর?

খানিকক্ষণ ভূতের মতো দাঁড়িয়ে, ঘোড়া থেকে নামল। এগিয়ে গেল ঝুপড়িগুলোর কাছে। ডাকল, 'কে আছ!'

কেউ উত্তর দিল না।

পুরোনো বন্ধুদের নাম ধরে ডাকল, 'দীপ সিং!…সুজন সিং!…হুকুমা সিং!…মহেন সিং!…'

সাড়া দেওয়ার মতো আজ আর কেউ নেই।

'তোমরা কেউ সাড়া দিচ্ছ না কেন!' পঞ্জাব সিং ধৈর্যহারা হয়ে বলল, 'কেউ সাড়া দাও। তোমাদের ভয় নেই—আমি পঞ্জাব সিং, দরবারা সিংয়ের বেটা।'

ঝুপড়িগুলোর ভেতরে যেন ফিস্‌ফাস শব্দ উঠল।

পঞ্জাব সিং অধীর আগ্রহে বলল, 'এস এস—তোমরা কেউ বাইরে এস। দোহাই তোমাদের—আমার বাড়ির খবর বলো।'

কয়েকটা ঝুপড়ির ভেতর থেকে প্রায় হামাগুড়ি দিয়ে কয়েকজন প্রাচীন খালসা বেরিয়ে এল। পেছনে পেছনে এল কয়েকজন প্রাচীনা বৃদ্ধা। ছোটখাট একটা দল এসে দাঁড়াল পঞ্জাব সিংয়ের সামনে। নীরবে ঘোলাটে চোখ তুলে অন্ধকারে তাকিয়ে রইল তারা পঞ্জাব সিংয়ের দিকে।

পঞ্জাব সিং অধীর কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল, 'আমার বাড়ির সব কোথায় গেল—বলো, চুপ করে থেক না।'

প্রাচীন খালসা হাকিম সিং কম্পিত গলায় বলল, 'তারা কেউ নাই।'

'কেউ নাই!' পঞ্জাব সিং থম্‌থমে গলায় বলল, 'আমার বাবা!'

'—গুলিতে ঝাঁঝরা তার লাস পাওয়া গিয়েছিল পাহাড়তলির এক জঙ্গলে—একা ব্রতচারীরা তার সৎকার করেছে।'

'আমার মা!'

'—তাকে তুফানের সঙ্গে বেঁধে ঘষটে ঘষটে নিয়ে গেছে ফিরিঙ্গীরা। দ্বিতীয়বার

আবার ফিরে এসেছিল তুফান—রূপান কাউর তার গলা জড়িয়ে ধরেছিল—ছাড়তে চায়নি।'

'ধিয়ান সিং ··· তার পরিবার ··· আমার দুই বেটা ··· দেবী !···'

'—ধিয়ান সিংকে ফাঁসিতে লটকে দিয়ে গেছে ফিরিঙ্গীরা আর দেবী ও তার দুই বেটা অন্যান্য মেয়েদের নিয়ে আছে নামধারী-গুরু রাম সিংয়ের আশ্রমে।'

'সে কোথায় ?'

'ভাইনী।'

'কার সংগে গেছে জান ?'

'বিহঙ্গম নারায়ণ সিং।'

এমন নাম তো কখনো শোনেনি পঞ্জাব !

পঞ্জাব সিং বসে পড়ল মাটিতে।

সামনে বুড়োবুড়ির দল দাঁড়িয়ে রইল কিছুক্ষণ—চুপচাপ। তারপর একে একে গিয়ে ঢুকল যে যার ঝুপড়িতে। কেউ জিজ্ঞেস করল না পঞ্জাব সিংয়ের ভালমন্দের একটা খবরও।

পঞ্জাব সিং একাই বসে রইল সেই ঝুপড়িগুলোর সামনে। অনেকক্ষণ সন্ধ্যাতারা ডুবে গেল কখন। অন্ধকার ঘন হয়ে এল। চারিদিক নিঃসাড়। খাঁ খাঁ করছে দিগন্ত ছোঁয়া প্রান্তর। ওই রকম খাঁ খাঁ করতে লাগল পঞ্জাব সিংয়ের মনের ভেতরটাও।

একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে একসময়ে গা ঝাড়া দিয়ে উঠল পঞ্জাব। সারাদিন ঘোড়াটা দানাপানি পায়নি। বোধ করি পেটের জ্বালায় নেমে গিয়েছিল মাঠে—ঘাস খাচ্ছিল। তাকে গিয়ে ধরে আনল। বলল, 'চল্ বেটা—আরও বহুৎ দূর তোকে যেতে হবে।'

মাঠ প্রান্তর ভেঙে বিজ্‌লী ছুটল ভাইনীর দিকে।

সারাটা পথ একটা কথাই সে ভাবতে ভাবতে চলল : আর লাহোর নয়—ছেড়ে দেবে সৈনিকবৃত্তির জীবন। পিম্পল গাঁওয়ে নতুন করে ঘর বাঁধবে দেবী আর দুই বেটাকে নিয়ে। পৈত্রিক জমিজিরেৎ যা আছে তাই নিয়ে চাষ-আবাদ করবে। লাহোরে সে আর ফিরবে না।···

ভাইনীতে এসে সে বিরাট আশ্রম, বিরাট গুরুদ্বার দেখে হকচকিয়ে গেল। বহু মানুষের আনাগোনা—সকলেই যেন কর্মব্যস্ত। একে ওকে শুধিয়ে—অনেক খোঁজ খাঁজ করে দেখা পেল বিহঙ্গম নারায়ণ সিংয়ের।

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তার দিকে কয়েক পলক তাকিয়েই নারায়ণ সিং বলল, 'তুমি পঞ্জাব সিং।'

পঞ্জাব সিং এ মানুষকে চেনে না। থতমত খেয়ে গেল। বলল, 'আপনি আমাকে চেনেন?'

'বিলক্ষণ।' নারায়ণ সিং হাসল। বলল, 'তারপর—কি মনে করে?'

পঞ্জাব সিং বলল, 'বুঝতেই পারছেন—কেন এসেছি।'

'তা অনুমান করতে পারছি।' নারায়ণ সিং বলল, 'স্ত্রী ও ছেলেদের নিয়ে যেতে চাও। আমি খবর দিচ্ছি দেবীকে। তাকে এখান থেকে নিয়ে যাওয়ার দায় কিন্তু তোমার। আমি দেখা করিয়ে দিচ্ছি।'

শেষের কথাগুলোয় কেমন ঘাবড়ে গেল পঞ্জাব।

নারায়ণ সিং তাকে একলা একটা ঘরে বসিয়ে বোধ করি দেবীকে ডাকতে গেল। পঞ্জাব সিং মনে মনে নিজেকে তালিম দিতে লাগল—কি বলবে সে দেবীকে, কেমন ক'রে কোলে তুলে নেবে দুই ছেলেকে।

খানিকবাদে দুই ছেলেকে সামনে নিয়ে ঘরে এসে ঢুকল দেবী। সেই দীপ্ত ঋজু চেহারা, সেই ডাগর ডাগর দুই চোখ, যেন খোলা তলোয়ার। পঞ্জাব বসে ছিল, উঠে দাঁড়াল। চোখ আটকে গেল সামনে দুই ছেলেকে দেখে। ওরা কত বড় হয়ে গেছে এই ক'বছরে। পঞ্জাব সাগ্রহে দুই হাত বাড়িয়ে বুকে জড়িয়ে ধরতে গেল ওদের—অস্ফুট কণ্ঠে বলে উঠল, 'হরনাম ··· উধম ··· বেটা!'

'খবর্দার ছুঁয়ো না। —না।···' চীৎকার করে উঠল দেবী কাউর।

পঞ্জাব থমকে গেল—ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে রইল দেবীর দিকে। নিজেকে সামলে নিয়ে আস্তে আস্তে বলল, 'আমি কি অজাত অচ্ছুৎ দেবী যে, ওদের ছুঁলে জাত যাবে?'

'আমাদের আশ্রমে অজাত অচ্ছুৎ ঢের আছে - তাদের ছোঁয়ায় জাত যায় না।' দেবী দীপ্ত কণ্ঠে বলল, 'কিন্তু জাতিদ্রোহী বিশ্বাসঘাতকের ছোঁয়ায় আত্মা পর্যন্ত নোংরা হয়ে যায়।'

পঞ্জাবের ঘাড় হেঁট হয়ে গেল।

দেবী ঘুরে দাঁড়াল। ছেলেদের ঠেলা দিয়ে বলল, 'চল্ বেটা।'—

পঞ্জাব ওর পথ আটকে দাঁড়াল। হাতজোড় করে বলল, 'আমায় ক্ষমা করো দেবী। আমি মানছি—আমি জাতিদ্রোহী, আমি বিশ্বাসঘাতক। আমি ভুল করেছিলাম, কিন্তু ভুলের—পাপের কি প্রায়শ্চিত্ত নেই দেবী? আমি ঠিক করেছি,

সব ছেড়ে-ছুড়ে দিয়ে পিম্পল গাঁওয়ে এসে বাস করবো, তোমাদের নিয়ে চাষআবাদ খেতি ক'রে বাকি জীবনটা কাটিয়ে দেবো।'

দেবী বলল তেমনি দীপ্ত গলায়, 'ভীরু কাপুরুষেরাই ওই রকম কথা বলে। ছাড়ো পথ।'

পঞ্জাবের আত্মাভিমানে লাগল। বলল, 'ভীরু কাপুরুষ আমি নই দেবী। প্রাণের ভয় আমি করি না। আমি খালসার সন্তান।—আমি খালসা।'

দেবী বিদ্রূপের হাসি হাসল। বলল, 'ওই নাম তুমি উচ্চারণও ক'রো না। খালসা ছিলেন আমার শ্বশুর, আমার বাবা, আমার ভাই—পিম্পল গাঁওর আরও ঢের জোয়ান যারা দুশমনের সঙ্গে লড়াই করে প্রাণ দিয়েছে।'

'দেখো—আমিও প্রাণ দিতে পারি দেবী।'

'দিয়ো। সেদিন আমার দুই বেটাকে বুকে জড়িয়ে ধরে তোমার পায়ে পড়ে আমি মাথা কুটে কুটে কাঁদবো। আজ তুমি আমার লজ্জা, আমার অপমান!...'

যেমন দীপ্ত ভঙ্গীতে ঘরে ঢুকেছিল দেবী, তেমনি ভাবেই চলে গেল পঞ্জাবের সামনে দিয়ে।

অনেকক্ষণ স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল পঞ্জাব সিং। তারপর শেষ আশা ও ভরসা হিসেবে আবার গিয়ে ধরে পড়ল বিহঙ্গম নারায়ণ সিংকে।

'আপনি একটা উপায় করে দিন। কোন দেবতার কাছে কি প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে বলুন—আমি রাজি আছি।'

নারায়ণ সিং হাসল। বলল, 'ও সব দেবদ্বার দেবীদ্বার আমরা ভুয়া মনে করি পঞ্জাব—আমাদের এক দ্বার গুরুদ্বার। আর গুরুর গুরু মহাগুরু গোবিন্দ সিং জী। আমাদের গুরু রামসিং শুধু তাঁকেই অনুসরণ করেন।'

'তবে গুরুজীকে বলে দয়া করে আমায় উদ্ধার করুন।'

'আমার গুরু বেদী মোহান্ত নয় পঞ্জাব—সামান্য ছুতোর মিস্ত্রীর সন্তান তিনি—জীবনের কঠিন শিক্ষা পেয়েছেন, এইমাত্র। তিনি কারুকে উদ্ধার-টুদ্ধার করেন না। তিনি দেন বাঁচার মন্ত্র। সে মন্ত্র পেয়েছিলেন তোমার বাবা, তোমার শ্বশুর।'

সাগ্রহে পঞ্জাব সিং বলল, 'আমি নেবো সেই মন্ত্র—আপনি ব্যবস্থা করে দিন দয়া করে।'

'আগে সে মন্ত্রের যোগ্য হতে হয় পঞ্জাব।'—কিছুক্ষণ নীরব থেকে নারায়ণ সিং আস্তে আস্তে বলতে লাগল, 'পঞ্জাবের আজ বড় দুর্দিন পঞ্জাব সিং—ফিরিঙ্গীদের বুটের তলায় সে ধুঁকছে। বিলাসী আর বিশ্বাসঘাতকে দেশ ভরে গেছে।...'

পঞ্জাব সিং মাথা হেঁট করে বসে রইল—একটা কথাও তার মুখে যোগাল না।

নারায়ণ সিং বলল, 'তুমি খৃষ্টান হয়েছিলে পঞ্জাব?'

পঞ্জাব বললে, 'হ্যাঁ।' তারপরে একটু থেমে বলল, 'গুরু রাম সিংও তো শুনেছি মিশনারীদের সঙ্গে থেকেছেন, কাজকর্ম শিখেছেন ...'

'ঠিক ঠিক—ঠিক পঞ্জাব।' নারায়ণ সিং বলল, 'তারপর তিনি ওদের বদ মতলব বুঝে বেরিয়েও এসেছেন। সে ঢের দিনের কথা পঞ্জাব।'

পঞ্জাব কিছুক্ষণ নীরব থেকে আস্তে আস্তে বলল, 'ফিরিঙ্গীর বাহিনী থেকে আমি চলে আসতে চাই, আর আমি লাহোরে ফিরে যেতে চাই না বিহঙ্গমজী।'

নারায়ণ সিং তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ তার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। তারপর বলল, 'ভাল। পিম্পল গাঁওয়ে আপাতত ফিরে গিয়ে নিজের যোগ্যতার প্রমাণ দাও। আগামী মাঘী উৎসবে গুরু তোমায় হয়ত মন্ত্র দিতেও পারেন। দেবীর মতামতও হয়তো তখন বদলাতে পারে।'

কিন্তু সে যে ঢের দিন! প্রায় বছরের কাছাকাছি। এতো সবে চৈত্র মাস!

পঞ্জাব সিং আর কিছু বলবার আগে নারায়ণ সিং নিজের কাজে চলে গেল।

পঞ্জাব বিষণ্ণ মনে ফিরে চললো পিম্পল গাঁয়ে।

কুকা

সেদিন আনন্দ-যজ্ঞ উপলক্ষ্যে গুরু রাম সিংয়ের ভাইনি আশ্রমে ভারি ধুমধাম। আশ্রমের সামনে মস্ত মাঠ। মাঝখানে লম্বা একটা খুঁটি পুঁতে ওড়ানো হয়েছে কুকা সম্প্রদায়ের শ্বেত নিশান। খুঁটির গা ঘেঁষে বসানো হয়েছে চিত্রিত মঙ্গল-ঘট। মঙ্গলঘটের সামনে যজ্ঞভূমি। সেখানে ধিকি ধিকি জ্বলছে হোমের আগুন। ঘি, মধু, ধূপ, ধুনো পোড়ার এক অপূর্ব গন্ধ ছড়িয়ে পড়ছে চারদিকে।

আশ্রম ঘেঁষে বাঁধা হয়েছে উঁচু মঞ্চ। সেখানে দর্শক হিসেবে রয়েছে গুরুর বড় বড় সব অনুগামী আর এক শ' বর-কনের বাবা-মায়েরা। গ্রামান্তরের বহু মানুষজনও এসে জুটেছে এই আনন্দ-যজ্ঞ দেখবার জন্যে।

যজ্ঞভূমির সামনে মাথা নত করে গুরুর আশীর্বাদ গ্রহণ করেছে এক শ' বর-কনে। 'সারাজীবনের এ বন্ধন তোমাদের সুন্দর হোক—পবিত্র হও, হও দরিদ্রের বন্ধু।—' গুরুর এই আশীর্বাদ টুকুই ওদের বিয়ের মন্ত্র। গুরুকে প্রণাম করে সার বেঁধে দাঁড়াল এক শ' বর-কনে—পাশাপাশি। যজ্ঞভূমির চারদিকে বিরাট চক্রাকারে প্রদক্ষিণ সুরু করল ওরা। ঘুরবে ওরা সাত পাক—এই ওদের সপ্তপদী।

এ বিয়ের খরচ নাম মাত্র—বর-কনে পিছু মাত্র এক টাকা চার আনা। বামুন—বেদজ্ঞ নেই, মোহান্ত গুরুর সেলামী নেই—নেই ধোপা নাপিতের পাওনাগণ্ডার কচকচি। এর ওপর আগে ছিল কনে-পণ, মোটা পণের টাকা দিয়ে মেয়ে ঘরে আনতে হতো। সাধারণ গ্রামের মানুষ ফতুর হয়ে যেত এই বিয়ের ব্যাপারে।

সেদিনের আনন্দ-যজ্ঞের সামনে বসে বুড়ো বুড়িরা সে-সব কথা বলাবলি করে—কেমন করে তারা ফতুর হয়ে গেছে।

অনুষ্ঠান প্রায় শেষ হয়ে এসেছে— এমন সময় বেধে গেল এক গোলমাল। কোথা থেকে ছুটে এসেছে একদল লোক—ক্রুদ্ধ, মারমুখি। একশো' বর-কনের বেষ্টন ভেদ করে ছুটে গেল যজ্ঞভূমির দিকে। গাল পাড়তে লাগল রাম সিংকে, 'অনাচারী,

বধর্মী, পাষণ্ড! এই আমরা পৈতে ছুঁয়ে অভিসম্পাত দিচ্ছি—তুই মরবি, মরবি, মরবি—নির্বংশ হবি।' পৈতে টেনে বার করল দ্বিবেদী, ত্রিবেদী, চতুর্বেদী, মোহান্তের দল।

রুখে ছুটে এল রাম সিংয়ের কুকা শিষ্যেরা।

রাম সিং তাদের হাত তুলে থামিয়ে দিল। বলল, 'যতো অভিসম্পাত দিতে চায়—দিক, কিছু ব'লো না। ওদের রুজিরোজগারে ঘা লেগেছে—বুঝতে পারছ না।'

'ওরে, তোর মাথায় বজ্রাঘাত হবে। তেরাত্তির পোয়াবে না—মরে যাবি। এই পৈতে ছিঁড়ে তোর যজ্ঞের আগুনে দিয়ে গেলাম পাষণ্ড। মরবি-মরবি-মরবি।'

কজন বামুন পটাপট পৈতে ছিঁড়ে ছুঁড়ে দিলে যজ্ঞের আগুনে।

বামুনদের পেছনে ছিল গ্রাম-গ্রামান্তরের ধোপা-নাপিতের দল। এই বিয়ে উপলক্ষ্যে রুজি-রোজগারে তাদেরও খুব ক্ষতি। তাদের পৈতে নেই—কি আর করে! রুষে গুরু রাম সিংকে গাল পাড়তে লাগল। গুরু রাম সিং শুধু হাসতে লাগল।

বামুন, মোহান্ত আর ধোপা নাপিতের দল শাসিয়ে গেল—এর প্রতিশোধ তারা নেবেই নেবে।

ক'দিন তারা গ্রামে গ্রামে ঘুরে দল ভারি করে তুললো। যারা অর্থবান এবং গোঁড়া—রাম সিংয়ের দলকে তারাও পছন্দ করে না। এই ঘটনাকে উপলক্ষ্য করে সবাই তারা একযোগে মতলব আঁটতে লাগল—কি ভাবে রাম সিংয়ের কাজকর্ম বন্ধ করা যায়। শেষ পর্যন্ত একদিন তারা দলবল নিয়ে হাজির হলো লুধিয়ানার এক জবরদস্ত থানাদার আবু হোসেনের কাছে। হাতজোড় করে বললে, 'এ বিপদে আপনিই আমাদের রক্ষাকর্তা। আমাদের জাত যায়—ধর্ম যায়, রুজিও যেতে বসেছে। ওই পাষণ্ড রাম সিংয়ের দলের হাত থেকে আমাদের রক্ষা করুন।'

আবু হোসেন ধুরন্ধর থানাদার। ভয়ানক শিখ-বিদ্বেষী। বলল, 'রাম সিংয়ের চেলাদের উৎপাতের কথা কিছু কিছু আমার কানে এসেছে বটে। বহু গ্রামের পীর-পয়গম্বরের পবিত্র দরগা নাকি তারা ভেঙে দিয়েছে, পবিত্র সমাধি সব অপবিত্র করেছে—তাই না?'

বুড়ো এক চতুর্বেদী বলল, 'হুজুর, খাঁটি খবর পেয়েছেন। বহুকালের পবিত্র স্থান ওসব। কি মুসলমান, কি হিন্দু—সকলেই এতদিন ওখানে মানৎ করেছে, চেরাগ জ্বালিয়েছে, সিন্নি চড়িয়েছে। এখন রাম সিংয়ের চ্যালা এই কুকা হতচ্ছাড়ারা ওসব ভেঙে চুরমার করে দিল। বলে—ওসব নাকি কুসংস্কার! এত কবর সমাধি ছিল গ্রামে দেহাতে—সব ভেঙে গুঁড়ো করে দিলে মশায়।'

আবু হোসেন রাগে গস্ গস্ করে উঠে বলল, 'বটে !'

'আজ্ঞে, আমাদেরও জাত-ধর্ম ধরে টানাটানি।' দ্বিতীয় সাক্ষী এগিয়ে এল এক মোহান্ত। বলল, 'হারামজাদারা ধর্ম মানে না, শাস্ত্র জানে না। অচ্ছুৎ অজাত্ মানে না। জবরদস্ত ধরে ধরে বিয়েসাদি দিচ্ছে মশায়। এক সঙ্গে খাচ্ছে —বসছে। বাছ নাই—বিচার নাই। সব রসাতলে গেল! যতো চামার কামার কুমোর ছুতোয় নিয়ে, কিসান মজুর নিয়ে সে এক নারকীয় কাণ্ড।'

তৃতীয় সাক্ষী ত্রিবেদী ব্রাহ্মণ। বলল, 'আমার পৈতা ছিঁড়ে দিয়েছে হুজুর।'

ধোপা নাপিতরা কাঁদতে লাগল, 'আমাদের নাগরা-পেটা করেছে রাম সিংয়ের চ্যালারা।'

আবু হোসেন এতক্ষণ গোঁফ পাকাচ্ছিল—সহসা একটা 'হুম' শব্দ করে উঠল। বলল, 'তোমরা এক কাজ কর। আমার সামনে যা যা বললে—সব একটা কাগজে লিখে দাও। আমাদের পুলিস কমিশনার বহুৎ কড়া আদ্মি—আমি তোমাদেয় সেই আবেদন হুজুরে পেশ করে দেবো।'

বুড়ো চতুর্বেদী জানাল, 'খোটে গাঁয়ে আবার এক অনাচার হতে যাচ্ছে হুজুর। আমরা খবর জোগাড় করেছি—ওখানে নাকি দু'হাজার নতুন চেলা দীক্ষা নেবে। সিপাহী বিদ্রোহের বহুৎ সিপাহী দিল্লী থেকে পালিয়ে এসে গাঁয়ে ঘরে গা-ঢাকা দিয়েছিল হুজুর, সব এখন ওই দলেই ঢুকছে। পুরানো খালসা সেনারা তো আছেই। তা ছাড়া হবে ওই জবরদস্ত অনাচারের বিয়ে—তার বেদী ব্রাহ্মণ নেই, নাপিত ধোপা নেই, আচার অনুষ্ঠান নেই।'

আবু হোসেন বলল, 'ঠিক আছে। তোমরা লিখিত অভিযোগ করো।'

ব্রাহ্মণ মোহান্তের দল থানাদারের কাছে লিখিত অভিযোগ পেশ করে গেল। আবু হোসেন নিজে সেই অভিযোগ নিয়ে ছুটলো পুলিস কমিশনারের কাছে। ব্যাপারটার গুরুত্ব বুঝে সে অভিযোগ-পত্র চলে গেল গভর্নরের কাছে। সেখান থেকে নির্দেশ আসতে আসতে একটু দেরিই হয়ে গেল।

ইতিমধ্যে খোটে গাঁয়ে মিছিল করে এসে পৌঁছে গেছে গুরু রাম সিংহের হাজার চেলা, দু'শ ঘোড়সওয়ার। এখানেও আনন্দ-যজ্ঞের বিপুল আয়োজন : প্রায় আশীটি বর-কনে। তার ওপরে নতুন দীক্ষার জন্য পাঁচশ' জোয়ান ভোর ভোর স্নান করে পরেছে পবিত্র বেশবাস। মাথায় সিধা পাগড়ি, গলায় গ্রন্থি দেওয়া পশমের সুতোর মালা, হাতে নিয়েছে জপমালা, কোমরে ঝুলিয়েছে তীক্ষ্ণধার টাঙি, কেউবা ছোরা। গুরুর দীক্ষার বাণীও অল্প—কিন্তু দীপ্ত গম্ভীর :

'প্রথমে মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হও ; বাঁচার সব আশা ত্যাগ করো, ধুলোর সঙ্গে ধুলো হও। ...'

আনন্দ-যজ্ঞ শেষ। দীক্ষার কাজ তখনও শেষ হয়নি—প্রায় অর্ধেক বাকী। এমন সময় পুলিস প্রহরা নিয়ে হাজির হলো থানাদার আবু হোসেন। হুংকার ছাড়ল :

'থামাও বুজরুকি।'

রুখে দাঁড়াল হাজার কুকা। নতুন দীক্ষিতরা আজই মরতে তৈয়ার। আবু হোসেনের দল কিছুটা পেছিয়ে গিয়ে রাইফেল তাক করল।

আবু হোসেন হাঁক দিয়ে বলল, 'জমায়েৎ এক্ষুণি ভেঙে দিয়ে সরে না গেলে গুলি চলবে।'

রাম সিং পরামর্শ করতে বসল তাঁর পার্শ্বচর প্রবীণ শিষ্যদের সঙ্গে, প্রতিনিধি স্থানীয় সুবাদের সঙ্গে। ওরা জমায়েত ভেঙে আপাতত সরে যাওয়াই ঠিক করল।

আবু হোসেন পকেট থেকে একটা কাগজ বের করে পড়তে পড়তে জানিয়ে দিল, 'রাম সিং আজ থেকে অন্তরীণ।'

'অন্তরীণ !'

'হাঁ, গভর্নরের আদেশ—ওই আশ্রম আর ভাইনী গ্রাম ছেড়ে মিছিল করে রাম সিং আজ থেকে কোথাও আর যেতে পারবে না। আদেশ লঙ্ঘন করলে জেল জরিমানা দুই-ই হতে পারে।'

রাম সিং হাসল। দীর্ঘ ছ'ফুট লম্বা, বয়সে শীর্ণ মানুষটি, কিন্তু কোনো হুমকি বোধ করি তাকে স্পর্শ করতে পারে না। শুধু নীরবে শ্বেতশুভ্র দাড়িতে হাত বুলোতে লাগল। আর তার হাজার চেলা দাঁতে দাঁত চেপে চুপ করে রইল।

বেচারী পঞ্জাব সিং—তার দীক্ষা তখনো বাকি। সে ভিড় ঠেলে এগিয়ে গেল গুরুর দিকে—বলল, 'গুরুজী, আমাদের দীক্ষা যে এখনও বাকী !'

রাম সিং তার ব্যাকুল মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, 'চলো ভাইনী—সেইখানে হবে।'

হাজার কুকা ধ্বনি দিয়ে উঠল, 'সৎ ... শ্রী ... আ-কা-ল।...'

ওরা সেদিন মিছিল করে ফিরে চলল ভাইনীতে।

অন্তরীণ হয়ে রইল রাম সিং।

আবু হোসেন ও ডেপুটি পুলিস কমিশনার কোয়েনের কড়া রিপোর্টে টনক নড়েছে ফিরিঙ্গী সরকারের। তাই শুধু অন্তরীণ করে রাখলেও গোপনে তীক্ষ্ণ নজর রাখা হলো তার আশ্রম ও চ্যালাদের ওপর। গোপন নির্দেশ চলে গেল জেলায়,

থানায় থানায়। লুধিয়ানার মানুষ রাম সিং। অতএব কড়া নজর পড়ল বিশেষ করে লুধিয়ানার ওপরে।

কিন্তু কুকার দল তখন শুধু লুধিয়ানায় নয়, ছড়িয়ে পড়েছে সারা পঞ্জাবে। এক একটি অঞ্চল এক-একজন প্রতিনিধি বা সুবার অধিকারে ভাগ করা—কুকা কর্মীদের কাজকর্ম চলে সেই সুবার বা অঞ্চল প্রধানের নির্দেশে। এই সুবা শুধু পঞ্জাবে নয়—একদিকে দিল্লী অন্যদিকে সুদূর আফগানিস্তান পর্যন্ত তখন বিস্তৃত।

স্বয়ং রাম সিং মুড়কি রণক্ষেত্রের বীর সৈনিক। ফিরিঙ্গীরা তখন ছলেবলে কৌশলে পঞ্জাবকে একটু একটু ক'রে গ্রাস করবার চেষ্টা করছে। নিজের চোখে রাম সিং দেখেছে—সমাজের ওপর তলার খালসা চরিত্রের দুর্বলতা: তার লোভ, বিলাসিতা ও বিশ্বাসঘাতকতা। তার ওপর ফিরিঙ্গীদের শঠতা, ধূর্ততা ও নৃশংসতা। এমন দুর্দিনে তার মনে পড়েছিল একমাত্র গুরু গোবিন্দ সিংহের কথা। বুঝেছিল—চরম ভ্রষ্টতা থেকে পঞ্জাবকে বাঁচাতে হলে—শুধু শক্তি নয়, সিংহের হৃদয় নয়, চাই বজ্রকঠিন চরিত্র। তার জন্য পত্তন হলো ভাইনীর আশ্রম।

প্রথম দিকে তার অনুগামী ছিল মুষ্টিমেয়। বিত্তবান সর্দারদের কেউ নয় বরং তারই মত ভুক্তভোগী কিছু নীচু তলার পুরাতন খালসা সৈনিক। ক্রমে সে সংখ্যা বাড়ল—গ্রামের কিসান মজুরের দল এসে যোগ দিল। ঠিক সিপাহী বিদ্রোহের একমাস আগে ১৮৫৭ সালের ১৪ই এপ্রিল গুরু রাম সিংয়ের নেতৃত্বে আনুষ্ঠানিক ভাবে সূত্রপাত হলো 'নামধারী' সম্প্রদায়ের।* ইতিহাসে এরাই 'কুকা' নামে পরিচিত।* *

সিপাহী বিদ্রোহ ব্যর্থ হয়ে যাওয়ার পর বেড়ে উঠল কুকার দল। বাড়তে বাড়তে সে সংখ্যা দাঁড়াল চার লক্ষেরও বেশী। বিধ্বস্ত বিদ্রোহের বহু সিপাহী নূতন আশা ও উদ্দীপনায় এসে যোগ দিল কুকার দলে। এমনি প্রকাশ্যে ছিল ওদের ধর্ম-কর্ম চণ্ডীপাঠ বিলাতী জিনিস বর্জন, ফিরিঙ্গীর সঙ্গে নীরব অসহযোগিতা আর ভেতরে তৈরী হচ্ছিল একটা নতুন বারুদখানা। জোয়ান কুকারা স্বপ্ন দেখে—ফিরিঙ্গীর শাসন ধুলায় লুটিয়ে দিয়ে পঞ্জাব আবার মাথা তুলে দাঁড়াবে। সিপাহীরা স্বপ্ন দেখে—ফিরিঙ্গী বিতাড়িত স্বাধীন এক হিন্দুস্থানের।

সেদিন আশ্রমের এক ধর্মীয় অনুষ্ঠানে হাজার হাজার কুকার জমায়েৎ। আশ্রমের সামনে বাঁধা হয়েছে মঞ্চ। সেখানে চলেছে গ্রন্থপাঠ। আর আশ্রমের একান্তে

গুরু গোবিন্দ ওদের আদর্শ, সেই গুরু-নাম জপ থেকে ওদের সম্প্রদায়ের নাম হলো নামধারী। *হাঁক ডাক, জিগির-ওদের দলের একটা বৈশিষ্ট—সেই থেকে ওরা পরিচিত হলো কুকা নামে।

এক ঘরে কয়েকজন প্রবীণ নেতা আলো-অন্ধকারে বসে তৈরী করছে এক তালিকা। কুকাদের সামরিক শিক্ষা চাই—তৈরী হচ্ছে তারই পরিকল্পনা।

মেহ্‌তাব সিং বলল, 'লুকা সিংকে গুরুদেব কাশ্মীরে পাঠিয়েছিলেন—ওখানকার রাজা আপাতত দু'শ কুকাকে সামরিক শিক্ষা দিয়ে বাহিনী গড়তে পারে, রাজী হয়েছেন।'

কুমার সিং বলল, 'নেপাল থেকেও সুখবর পাওয়া গেছে। ওখানেও দু'শ কুকাকে পাঠিয়ে সামরিক শিক্ষা দিয়ে আনা যায়।'

'মাত্র চারশ হলো।' নাহার সিং গাঁইগুঁই করে বলল, 'কিন্তু সংখ্যা আরও কিছু বাড়ানো যায় না?'

'চেষ্টা করতে হবে ভাইয়া।' মেহতাব সিং বলল, 'পর পর নতুন দল পাঠিয়ে আপাতত শিখিয়ে আনতে হবে। মনে রেখ—ওই দুই রাজ্যেই এক-একজন ফিরিঙ্গী প্রতিনিধি কড়া নজর দিয়ে বসে আছে।'

কথাটা সত্যি—'রেসিডেন্ট' হয়ে বসে আছে এক-একজন ধুরন্ধর ইংরেজ।

সবাই চুপ করে গেল। এবং মনে মনে দাঁতে দাঁত ঘষতে লাগল। ওরা ওদের নিজস্ব চর মারফৎ জানতে পেরেছে—ফিরিঙ্গীরা সারা পঞ্জাবেও ওদের ওপর নজর রাখছে। খবর জোগাচ্ছে গোঁড়া ব্রাহ্মণ মোহান্তের দল—তাদের সঙ্গী ধোপা নাপিতেরা আর ইংরেজের মোসাহেব ধনী সর্দার-জমিদার ও ব্যবসায়ীর দল।

কুমার সিং গুরুগম্ভীর কণ্ঠে বলল, 'হুঁশিয়ার ভাই খালসা। সময়টা বড় কঠিন। একটা ছুতো পেলেই দুশমন ঘাড়ে ঝাঁপিয়ে পড়বে।'

এমন সময় আর একজন জোয়ান মতো কুকা ঘরে ঢুকল। জালন্ধর-হোসিয়ারপুর অঞ্চলের যুবা-প্রতিনিধি। তার হাতে কিছু কাগজ। বলল, 'নামের তালিকা প্রস্তুত।'—বলে হাতের কাগজ রেখে দিল সকলের সামনে।

নাহার সিং বলল, 'যাদের নাম দিলে তারা সবাই কাশ্মীর নেপাল যেতে রাজী তো?'

লোকটি বলল, 'গুরুর আদেশে তারা মরবার জন্য তৈয়ার।'

আরও একটি মানুষ ঘরে ঢুকল নিঃশব্দে। খবর দিল, 'সর্দার গুরুচরণ সিং এবার রওয়ানা হবেন।'

'চলো—চলো। দেখা করি।' মেহ্‌তাব সিং বলল, 'আবার কতদিন পরে দেখা হবে সর্দারজীর সঙ্গে কে জানে!'

সকলে ব্যস্ত হয়ে দেখা করতে চলল গুরুচরণ সিংয়ের সঙ্গে রাম সিংয়ের ঘরের উদ্দেশ্যে। গুরুচরণ সেখানেই অপেক্ষা করছে।

প্রায় পঁচাত্তর বছরের বৃদ্ধ গুরুচরণ সিং। মানুষটি দেখতে রোগা রোগা—কিন্তু বয়সের ভারে এখনও ভেঙে পড়েনি। খাড়া শিরদাঁড়া, খাড়া মাথা—শ্বেতশুভ্র দাড়িভরা মুখ, পাকা ভুরুর নীচে চোখ দুটো এখনও জল জল করছে পাহাড়ী বাজের মতো। কবে সেই মাত্র আঠারো বছর বয়সে সৈনিকবৃত্তি নিয়ে ঢুকেছিল রণজিৎ সিংয়ের খালসা বাহিনীতে। তারপর পঞ্চনদের অনেক জল বয়ে গেছে—চোখের সামনে দেখেছে একটু একটু করে পঞ্জাবের অধঃপতন। এক সময়ে বহু জায়গায় ঘুরে ঘুরে বেড়িয়েছে—কাবুল, কান্দাহার, গজনী, বোখারা পর্যন্ত। ওসব অঞ্চলের পথঘাট তার ভাল রকম জানা। ওদিকের বহু লোকের সঙ্গেও তার পরিচয়। তাই তারই ওপর আজ ভার পড়েছে মধ্য এশিয়ায় যাওয়ার—সমরখন্দের রুশ সেনাপতি মেজর জেনারেল আইভানোভের সঙ্গে দেখা করার। গুরু রাম সিং সামরিক সাহায্যের আশায় চিঠি পাঠাচ্ছে রুশ সেনাপতিকে।

মেহ্‌তাব সি, কুমার সিং, নাহার সিং—এরা ক'জন রাম সিংয়ের বড় বিশ্বস্ত অনুচর। ওরা এসে পৌছতেই রাম সিং তার দস্তখৎ করা চিঠিখানি এগিয়ে দিল ওদের দিকে—বলল, 'একজন কেউ পড়ো। সবাই শুনুক।'

আশ্রমের এক নিরালা প্রান্তে রাম সিংয়ের ঘর। সে ঘরে তখন এই ক'টি অতি বিশ্বস্ত মানুষ ছাড়া আর কেউ নেই। তবু মেহ্‌তাব সিং ঘরের বাইরেটা একবার দেখে এল। তারপর কুমার সিংকে বলল, 'পড়ো।'

কুমার সিং অনুচ্চ কণ্ঠে চিঠি পড়তে শুরু করল :

'গুরু গোবিন্দ সিং সহায়

'অত্রপত্রে কুকা সম্প্রদায়ের নেতা রাম সিং মাননীয় রুশ সেনাপতি মহাশয়ের বরাবরে সসম্মমে নিবেদন করিতেছি যে—

'আজ পবিত্র ভূমি পঞ্জাব ফিরিঙ্গীর অপশাসনে কলুষিত। দাসত্ব শৃঙ্খলে বন্দী। তবু জানাই যে, পঞ্জাবের বীর খালসাগণ ফিরিঙ্গীর দাসত্বকে মনেপ্রাণে ঘৃণা করে। এই দাসত্ব মোচনের জন্য বীর পঞ্জাব প্রস্তুত হইতেছে। এবং সেই শেষ মহান যুদ্ধে প্রায় চার লক্ষ সাহসী ও বীর কুকা তাহাদের নেতাকে অনুসরণ করিবে।

'আমাদের পূর্বকালীন গুরুগণ এইরূপ ভবিষ্যদ্বাণী করিয়া গিয়াছেন যে, খালসা বীরগণ রুশদিগরের সহায়তা লাভ করিয়া ফিরিঙ্গীগণকে পবিত্র পঞ্জাব ভূমি হইতে একদিন বিতাড়িত করিবে। যথা সময়ে আমাদের অভ্যুত্থান ঘটিবে। আশা করি তখন আপনাদের সহায়তা লাভে বঞ্চিত হইব না। ইতি

আপনার বন্ধুত্ব প্রার্থী—রাম সিং।'

চিঠি পড়া শেষ হলে রাম সিং বলল, 'আমার দস্তখতের পাশে তোমরাও সকলে দস্তখৎ করো।'

দস্তখৎ পর্ব শেষ হলো। রাম সিং চিঠিখানি এগিয়ে দিল গুরুচরণ সিংয়ের দিকে। গুরুচরণ সযত্নে চিঠিখানি ভাজ করে জোব্বার এক গোপন পকেটে চালান করে দিলে। তারপর একটু হেসে বলল, 'এবার তাহলে যাত্রা।'

যাত্রার মুহূর্তে রাম সিং আবেগে বুড়োকে বুকে জড়িয়ে ধরল। কম্পিত কণ্ঠে বলল, 'হুঁশিয়ার হয়ে যাবেন। শরীরের দিকে নজর রাখবেন। কাবুল পৌছতে পৌছতে শীত পড়ে যাবে। আপনি বরং আমার কম্বল দু'খানাও নিয়ে যান।'

'আরে ঘাবড়াও মৎ ভাইয়া।' গুরুচরণ সিং ঘরের বাইরে যেতে যেতে বলল, 'গুরুচরণ সিংকে যমই ভয় করে, শীত তো তুচ্ছ।'

আশ্রমের পেছনে এক গাছতলায় ঘোড়া প্রস্তুত ছিল। সকলে সেই দিকে এগিয়ে চলল। আশ্রমের সামনে তখন উৎসবের হট্টগোল চলছে। পেছনে কি হচ্ছে, কে কোথায় যাচ্ছে—কারুর নজর নেই। সদর রাস্তা ছেড়ে পঞ্জাবের নিরালা নির্জন প্রান্তরের ওপর দিয়ে একটি ঘোড়া তার সওয়ার নিয়ে ছুটে চলল সুদূর পশ্চিমে—সূর্য ঠাকুর যেখানে রাঙা আবির ছড়িয়ে তখন পাটে বসছে।

নিঃসঙ্গ যাত্রী। পথ বড় দূর ও দুর্গম। কর্তব্য আরো বেশী গুরুভার। সেই ভার নিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে চললো পঁচাত্তর বছরের এক বৃদ্ধ।

ছেলে চুরি

আশ্রমের উৎসবে যোগ দিতে পঞ্জাব সিংও এসেছিল ভাইনীতে। কাশ্মীর এবং নেপালে কিছু কুকাকে সামরিক শিক্ষার জন্য পাঠানোর ব্যবস্থা হচ্ছে—কথাটা তার কানেও গেল। কেমন একটা চাপা উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ল কুকাদের মধ্যে। পঞ্জাব সিংও চঞ্চল। এদিক ওদিক হন্যে হ'য়ে খুঁজতে লাগল বিহঙ্গম নারায়ণ সিংকে। খুঁজে খুঁজে পাকড়াও করল তাকে লঙ্গরখানায়। সেখানে চলেছে তখন দরিদ্র-নারায়ণের সেবা। গ্রাম-গ্রামান্তরের যত অক্ষম অন্ধ আতুর পাত পেড়ে বসেছে লঙ্গরখানার সামনের মাঠে। নারায়ণ সিং তাদের খাওয়া-দাওয়া দেখতে ব্যস্ত।

পঞ্জাব সিং বলল, 'আমার একটা কথা ছিল সিংজী।'

নারায়ণ সিং থমকে দাঁড়িয়ে বলল, 'বল।'

পঞ্জাব সিং বলল, 'শুনলাম নেপালে আর কাশ্মীরে অনেক কুকাকে পাঠানো হবে। আমাকেও পাঠাবার একটা ব্যবস্থা দয়া করে যদি করেন। যেখানে পাঠা-বেন—যাবো। সে নেপাল হোক আর কাশ্মীরই হোক।'

নারায়ণ সিং অবাক হয়ে বলল, 'তুমি যাবে! তুমি যাবে কী করতে?'

পঞ্জাব সিং নারায়ণ সিংয়ের প্রশ্নে ঘাবড়ে গেল। আমতা আমতা করে বলল, 'আমাকে কি অযোগ্য মনে করেন? আমার দীক্ষাও তো হয়ে গেছে।'

'তোমার মাথাটা খারাপ হয়ে গেছে পঞ্জাব সিং।'—নারায়ণ সিং বলল, 'যারা যাচ্ছে—তারা যাচ্ছে সামরিক শিক্ষা নিতে। তুমি পাকা পোক্ত সৈনিক বৃত্তির মানুষ। তুমি যাবে কি করতে! তোমার তো আর শেখার কিছু নেই।'

পঞ্জাব সিং ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে রইল নারায়ণ সিংয়ের মুখের দিকে। আস্তে আস্তে বলল, 'ওই পিপ্পল গাঁওয়ে সামান্য খেত খামার নিয়ে আমার আর ভালো লাগছে না সিংজী।'

'তবে যাও ফিরে লাহোরে—তোমার পুরানো চাকরিতে।'—নারায়ণ সিং যেন বিরক্ত হয়েই বলল।

চটে গেল পঞ্জাব সিং। বলল, 'লাহোরে আমি আবার ফিরে যেতে পারি—এ কথা আপনি বিশ্বাস করেন?'

ওর রাগ দেখে নারায়ণ সিং একটু হাসল। ওর কাঁধে একটা হাত দিয়ে বলল, 'শোনো পঞ্জাব সিং—তোমার ভালোর জন্যই একদিন তোমাকে পিপ্পল গাওয়ে ফিরে যেতে বলেছিলাম। আজও সেই কথা আবার বলি। গাঁয়ে ফিরে যাও, ঘর গড়ো—তোমার সংসার গড়ো। যেখানে তোমার ছেলে—তোমার স্ত্রী ফিরে যেতে পারবে একদিন! দরবারা সিংয়ের ভিটা শূন্য পড়ে থাকবে—এ আমি ভাবতে পারি না পঞ্জাব।'

কিন্তু সে ভিটা যে আজ শূন্যই লাগে পঞ্জাবের! পুরাণো ভিটাস বাপের আমলের সে বোলবোলাও আর নেই। পোড়া ভিটার ওপরে কোনো রকমে একখানা ছোটখাট ঘর খাড়া করেছে পঞ্জাব সিং—কিন্তু সেই ছোট্ট ঘরখানার অনেকখানিই যে আজ শূন্য পড়ে থাকে। মন তার হু হু করে। ছেলে দুটোও যদি তার কাছে থাকত! এই শূন্যতার রাক্ষুসে হাঁ থেকে পঞ্জাব বাঁচতে চায়। তাই পালাতে চায় গাঁ ছেড়ে আর কোথাও। না, আর তার ভাল লাগছে না।

অদূরে অন্ধ আতুরের দল পাত পেড়ে খেতে বসেছে, সামনে লঙ্গরখানার রান্নাঘরে অনেক মেয়ে কাজ করছে। বাতাসে ম' ম' করছে আগুনে সেঁকা জোয়ারা রুটির গন্ধ। ওদিকে তাকিয়ে পঞ্জাব সিং দেখতে পেল তার স্ত্রীকে—রুটি সেঁকছে। বাচ্চা দুটো উঠোনে ছুটোছুটি করে লুকোচুরি খেলছে। ওই তো হরনাম—ওই তো উধম।

মন্ত্রমুগ্ধের মত পঞ্জাব সিং এক পা এক পা করে এগুতে লাগল তার ছেলেদের দিকে।

... ওই দেখ, ছোট উধম এসে লুকিয়েছে একটা মস্ত মোটা গাছের আড়ালে—হরনাম তাকে খুঁজছে, খুঁজতে খুঁজতে চলে গেল আর এক দিকে। উধম হাসছে খিল্ খিল্ করে—হরনাম তাও শুনতে পেল না। কাঙালী ভোজনের হট্টগোলে চাপা পড়ে গেল তার কচি গলা।

পঞ্জাব সিং পেছন থেকে চেপে ধরল উধমকে—তারপর একেবারে ছোট দেহটাকে তুলে নিল বুকের ওপরে। বলল, 'বাস্—হাম পাকাড় লিয়া বেটা।'

উধম সিং ঘাবড়ে গিয়ে বলল, 'তুম্ কৌন?'

'ওরে বেটা—বাবাকে চিনিস না!' পঞ্জাব উধমের কচি মুখটাকে নিজের গলার খাঁজে চেপে ধরে বলল, 'আমি তোর বাবা।'

কী নরম মাথার চুল উধমের! নরম নরম ছোট্ট দেহটুকু। এক পলকে পঞ্জাব সিংয়ের সমস্ত মন ও দেহ যেন জুড়িয়ে গেল।

পঞ্জাব সিং বলল, 'এই বেটা, ঘোড়ায় চড়বি?'

উধম বলল, 'তোমার ঘোড়া আছে নাকি?'

'জরুর আছে বেটা—এক নম্বর ঘোড়া। ওটা তোকে দিয়ে দেবো।' পঞ্জাব সিং ছেলেকে বুকে চেপে এগিয়ে গেল যেখানে এক গাছে তার ঘোড়া বাঁধা আছে।

'দেখো বেটা—দেখো হামার ঘোড়া।' পঞ্জাব সিং বলল, 'এর নাম আছে বিজ্‌লী। সেরেফ বিজ্‌লীর মত ছুটবে—হাঁ।'

'বিজ্‌লী!'

নাম শুনে বিজ্‌লী তার ডাগর ডাগর দুটো চোখে দেখতে লাগল পঞ্জাবের কোলে উধমকে। গলা বাড়িয়ে শুঁকতে লাগল উধমের গা। উধম ভয় পেয়ে কুঁকড়ে বাপকে জড়িয়ে ধরল।

পঞ্জাব বললে, 'ডরো মৎ বেটা। ও তোমার সঙ্গে ভাব করতে চাচ্ছে। দাও—ওর মাথায় হাত বুলিয়ে দাও।'

উধম ভয়ে ভয়ে হাত বুলোতে লাগল। কে জানে—বিজ্‌লীও কী পঞ্জাবের মতো নরম তুলতুলে একটা পরশে বড় আরামে গলা বাড়িয়ে দিয়ে চোখ বুঝল কি-না।

পঞ্জাব বলল, 'আমার বিজ্‌লী খুব খেল কুদ্‌রৎ ভি জানে। চল দেখাই।' পঞ্জাব বিজ্‌লীকে খুলে দিল। সামনের ফাঁকা মাঠে নিয়ে চললো। শুরু হ'লো খেলা দেখানো।

'বিজ্‌লী, সিধা দু'পায়ে খাড়া হো—সিধা।' পঞ্জাব পেছনের দুটো পা একটু ছুঁয়ে দিলে।

বিজ্‌লী দাঁড়িয়ে গেল সিধা।

'বিজ্‌লী, এবার ছোটা সাহেবকে সেলাম কর। বৈঠ্ যা—বৈঠ্ যা।'

বিজ্‌লী সামনে দুপা ভাঁজ করে উবু হলো উধমের সামনে।

উধম খিল্ খিল্ করে হেসে উঠল। উৎসাহে সে-ই হুকুম করে বসল এবার, 'দু পায়ে খাড়া হো সিধা।'

বিজ্‌লী দু'পায়ে খাড়া হয়ে দাঁড়ালো আবার।

উধমের আনন্দ আর ধরে না। সে হাত-তালি দিয়ে উঠল।

পঞ্জাব বললে, 'যা—অব দৌড় দেখা বিজ্‌লী'। আঙুল তুলে দেখিয়ে দিলে দূর প্রান্তরের দিকে।

ইঙ্গিত মাত্রে বিজ্‌লী ছুটলো—প্রথমে দুল্‌কি—তারপর দেখতে দেখতে বিদ্যুতের গতি। উধম অবাক চোখে দেখছে—দেখতে দেখতে কোথায় দূরে যেন একটা সাদা বিন্দুর মতো হয়ে গেল।

উধম বললে, 'ভাগ্‌ গিয়া!'

'নেহি বেটা।' পঞ্জাব হেসে বললে, 'এখুনি আবার ঘুরে আসবে।'

উধম অবাক চোখ মেলে দেখতে লাগল—দূর দিগন্তের পার থেকে বিজ্‌লী আবার ছুটে এসে হাজির। কি জানি, খেলার আনন্দ বুঝি লেগেছে আজ বিজ্‌লীরও মনে! ফিরে এসে সে একেবারে উধমের সামনে হাঁটু গেড়ে বসল।

পঞ্জাব বললে. 'দে বেটা—ওর মাথায় হাত বুলিয়ে দে।'

উধম এবার সাহস করে হাত বুলোতে লাগল। বিজ্‌লী চোখ বুজলো।

পঞ্জাব ভাবতে লাগল আর এক জনের কথা—দেবীর কথা। বাহিনী থেকে ছুটিছাটায় ঘরে ফিরে এলে দেবী এমনি করে আগে বিজ্‌লীর মাথায় গায়ে হাত বুলিয়ে দিত।

খাল্‌সা সিপাহীর ঘর—ওদের কাছে ঘোড়ার বড় আদর। ওরা নিজেদের ঘোড়া নিয়ে বাহিনীতে যোগ দিতে পারত—ঘোড়াকে তালিম শিক্ষা দিয়ে করে তুলতো মানুষের প্রিয়তম বন্ধু, সাথী। এমান ছিল তুফান—এমনি এই বিজ্‌লী। দরবারা সিংয়ের নিজের তালিমে তৈরী দুই ঘোড়া। তুফান গেছে, আছে শুধু বিজ্‌লী।

উধম বলল, 'বিজ্‌লী খুব ভালো।'

পঞ্জাব হেসে উধমকে আবার কোলে তুলে নিয়ে বললে, 'হাঁ—বিজ্‌লী খুব ভালো।'

ঘোড়াটা উঠে দাঁড়িয়ে ড্যাবড্যাবে চোখ মেলে দেখতে লাগল উধমকে।

পঞ্জাব ঘোড়াটার কাঁধ দাবকে বললে, 'কি দেখচিস বিজ্‌লী। এ আমার বেটা আছে—তোর ছোটা মালেক। হাঁ। লে—ছোটা মালেক্‌কে সওয়ার লে।' বলে উধমকে একেবারে ঘোড়ার পিঠে বসিয়ে দিয়ে বলল, 'ঠিক্‌সে বৈঠো বেটা।'

পঞ্জাব সিং লাগাম ধরে রইল।

উধম সিং ঘোড়ার পিঠে ধাক্কা দিয়ে বলল, 'হেট্‌ হেট্‌—চল্‌—'

পঞ্জাব সিং বলল, 'ধীরে চল বিজ্‌লী।'

বিজ্‌লী ধীরে ধীরে চলতে সুরু করল। বালকের আনন্দ আর ধরে না, তার জীবনে প্রথম ঘোড়ায় চাপা। খিল্ খিল্ করে হেসে উঠল।

কি জানি বিজ্‌লীও হাসলো কিনা—সে চিঁ-হিঁ-হিঁ করে উঠল। পিঠে সামান্য একটা নরম বোঝা নিয়ে তার পিঠ সুড় সুড় করে উঠলো কি না—দেখা গেল, গায়ের চামড়া তার শিউরে শিউরে উঠছে।

পঞ্জাব সিংও হাসল। আঃ, এই ছোট্ট শরীরটার কাছাকাছি কি আনন্দ—ওই কচি গলার হাসিতে প্রাণ যেন জুড়িয়ে যায়। পিম্পল গাঁওর সেই শূন্য ছোট্ট কুঁড়েতে যদি এই হাসি রোজ শুনতে পেত পঞ্জাব সিং! তার মনে হল—তা হলে আর কোন আপশোস থাকত না। হঠাৎ তার মনে হয়, উধমকে নিয়ে সে যদি চলে যায়? দেবীর কাছে থাক হরনাম—উধম থাকুক না তার কাছে। ঠিক। উধম তার বেটা—কেন সে রাখবে না তার কাছে।

উধম এই সময়ে দূরে তার দাদাকে দেখতে পেয়ে চিৎকার করে ডেকে উঠল, 'দাদা—এই দেখ—'

'চুপ বেটা—চিল্লাও মৎ।'

হঠাৎ কি যে হলো পঞ্জাব সিংয়ের—লাফ দিয়ে ঘোড়ায় চেপে বসল নিজেও। ছেলেকে কাঁধের কাছে চেপে ধরে ছুটিয়ে দিল ঘোড়া।

হরনাম সিং তখন চেঁচাচ্ছে, 'ওই দেখো মা, ওই দেখো—ভাগতা হ্যায়। উধমকে নিয়ে চলে যাচ্ছে কে!'

দেখতে দেখতে সবটা কেমন উল্টোপাল্টা হয়ে গেল। উধমও চেঁচাচ্ছে প্রাণপণে—

'না না, আমি যাব না। আমাকে নামিয়ে দাও। নামিয়ে দাও। দাদা··· মা!'···

রুটি সেঁকা চিমটে হাতে এগিয়ে এসেছে দেবী। দেখতে পেল প্রান্তরে ছুটন্ত সাদা ঘোড়াটাকে। বুঝতে দেরী হলো না—কে ছুটছে উধমকে নিয়ে। ফেটে পড়ল ক্ষোভে, ক্রোধে, উত্তেজনায়। চিৎকার করে বলে উঠল, 'পাকড়ো··· উয়ো চোর হ্যায়, ডাকু হ্যায়···আমার ছেলে গেল।'···

এমন সময় দেবীর চেঁচামেচি শুনে এসে দাঁড়াল নারায়ণ সিং। মুহূর্তে ব্যাপারটা বুঝে নিল—জিজ্ঞাসু চোখে তাকাল দেবীর দিকে। দেবী তখন আগুনের মতো জ্বলছে দাউ দাউ করে।

'পাকড়ো ··· পাকড়ো শয়তানকো!'···

নারায়ণ সিং শুধু বলল, 'ছিঃ দেবী।'

নারায়ণের পা ধরে দেবী বলল, 'না না—আমার ছেলেকে এনে দিন। ছেলেকে এনে দিন। ··· আমার ছেলে চাই।'

নারায়ণ সিং কয়েকজন তরুণ কুকাকে পাঠিয়ে দিল, 'যাও, দেবীর ছেলেকে ফিরিয়ে আনো। পঞ্জাব সিং যদি আসতে না চায় জোর করে ধরে এনো না।'

জনা দশেক তরুণ কুকা সঙ্গে সঙ্গে ছুটল ঘোড়া নিয়ে।

ওরা পাকা ঘোড়সওয়ারের দল—আশ্রমের ঘোড়াগুলোও তেমনি পয়লা নম্বরের। ঘণ্টা কয়েকের মধ্যে ওরা উধমকে নিয়ে ফিরে এল আশ্রমে। সঙ্গে পঞ্জাব সিংও এসেছে স্বেচ্ছায়। সন্ধ্যে তখন উৎরে গেছে।

নারায়ণ সিং মৃদু ভৎ‍র্সনা ভরা কণ্ঠে বলল, 'এ আবার কী পাগলামী শুরু করলে পঞ্জাব!'

'পাগল হইনি—এবার সত্যিই বোধ করি পাগল হয়ে যাবো সিংজী। আমার নিজের ছেলে—তাকে আমি বাড়ি নিয়ে যেতে পারি না?'

'ও কথা আমাকে নয়—ওই ঘরে দেবী আছে, তাকে গিয়ে বলো।'—বলতে বলতে নারায়ণ সিং সেখান থেকে সরে গেল।

পঞ্জাব সিং রুখে এগিয়ে গেল দেবীর ঘরের দিকে। কিন্তু ঘরে ঢুকবার আগেই সামনে এসে দাঁড়াল দেবী ঘরের দরজা আগলে। বলল, 'খবর্দার, ঘরে ঢোকবার চেষ্টা করবে না।'

থমকে দাঁড়াল পঞ্জাব। দেবীর মতই বেপরোয়া গলায় বলে উঠল, 'চাই না ঢুকতে। আমি জানতে চাই—একটা ছেলে কেন আমার কাছে থাকবে না?'

দেবী বলল, 'বিল্লির কাছে আমি ছেলে পুষতে চাই না। আমি চাই আমার ছেলেরা শের হোক।'

'আমি বিল্লি?'—পঞ্জাব গর্‌গর করে উঠল।

'শেরকে সে কথা মুখে বলতে হয় না।'—বলে দড়াম্ করে দেবী পঞ্জাব সিংহের মুখের ওপরে দরোজা বন্ধ করে দিলে।

বিছের কামড়ে বড় জ্বালা। তেমন হাজার হাজার বিছের কামড় মাথায় নিয়ে পঞ্জাব সিং ফিরে চললো পিম্পল গাঁয়ে।

সাথী

গাঁয়ে ফিরে চাষ-আবাদে মন দিল পঞ্জাব সিং।

ধিয়ান সিংয়ের জমি আবাদ করতে এল ভাইনী থেকে কুকা জোয়ানের দল। তারা আড় চোখে দেখতে লাগল পঞ্জাবের কাণ্ড কারখানা। এত দিন পঞ্জাব সৈনিক-বৃত্তি নিয়েই ছিল—চাষ-আবাদের কাজ অল্পই জানে। স্বভাবতই তার কাজ যাচ্ছে পিছিয়ে। গাঁয়ের গরীব কৃষি-কামিন কম নেই—কিন্তু তাদেরও সে সময় মতো কাজে পায় না। সবাই ছোটে ধিয়ান সিংয়ের জমির দিকে—কুকাদের সাহায্য করতে।

একদিন এক কামিনকে সে জিজ্ঞেস করল, 'আমার কাজে ঠিক মতো আসো না কেন? ওরা কি বেশী রোজ দেয়?'

লোকটা বললে, 'নেহি জী। দেবীজী যে সব আমাদের বিলিয়ে দিয়ে যায়। যা বাঁচে—চলে যায় ভাইনীর আশ্রমে।'

পঞ্জাব থেমে গেল—আর কথা বাড়ালো না। শুধু দেখতে লাগল দিনের পর দিন—পুরো দমে কি ভাবে কাজ চলেছে ধিয়ান সিংয়ের জমিতে।

ঢিকিয়ে ঢিকিয়ে চলল পঞ্জাবের আবাদের কাজ। এ অঞ্চলে বর্ষা মৌসুমীর মেজাজ বড় খাপছাড়া—বড় কৃপণের মতো। তার মেজাজ মতো কাজ শেষ করতে না পারলে ফসলে মার খেতে হয়। পঞ্জাব সিংয়ের ভাগ্য প্রায় সেই দিকে এগিয়ে চলল। আবাদের কাজ তার ঢের বাকী।

এমন দিনে ধিয়ানের সব জমি আবাদ করা সেরে জোয়ান কুকার দল গাঁয়ের সব কামিন জড়ো করে এসে পড়ল পঞ্জাব সিংয়ের জমিতে। লাগাল হাত।

পঞ্জাব তাদের ডাকেনি। পঞ্জাব সিং নীরস গলায় বললে, ‘আমি তো তোমাদের ডাকিনি।’

তরুণ কুকা লখা সিং হেসে ফেললে। বললে, ‘তোমার কাজকর্ম দেখছিলাম ভাই সাহেব। যে ভাবে চলছিল তাতে এক মরশুম নয়—দু’ মরশুম লাগতো।’

পঞ্জাব নিজের গরব বজায় রেখে বললে, ‘এতদিন ক্ষেত-খামার তো করিনি। আমি সৈনিক ছিলাম।’

লখা সিং সকৌতুকে চোখ পিট্ পিট্ করে বললে, ‘গোসা করো না ভাই সাহেব, আমাদের গুরুজী ক্ষেত খামারও শিখিয়েছে—লড়াই ভি শিখিয়েছে। এবার পুরা তালিম নিতে নেপাল পাঠাবে আমাদের।’

পঞ্জাব সিং থম্‌কে গেল। মনে মনে কি একটু ভাবল: নেপাল পাঠাবে ওদের পুরা তালিম নিতে! তারপর বললে, ‘আমার ক্ষেতে তোমাদের যদি কাজ করতে না দিই।’

‘আমাদের আশ্রমের যা নির্দেশ আমরা তাই করতে এসেছি ভাই সাহেব।’ লখা সিং বললে, ‘মনে কোন অভিমান রেখো না। আমাদের ভুল বুঝো না।’

না, ভুল ঝোবার কোন কারণই রাখল না ওরা। হাসতে হাসতে গান গাইতে গাইতে বিশটা জোয়ান যেন যাদুমন্ত্রে পঞ্জাব সিংয়ের আবাদের কাজ শেষ করে দিয়ে চলে গেল।

তবু পঞ্জাবের মনে সুখ নাই—স্বস্তি নাই।

তিন মাস পরে ফসল পাকলো। এবার ফসল তোলার পালা. ঝাড়াই—মাড়াইয়ের পালা।

আবার ভাইনী থেকে এসে পড়ল নতুন বিশ জোয়ান—দল নেতা সেই লখা সিং। আগে উঠল ধিয়ান সিংয়ের জমির ফসল। তারপর পঞ্জাব সিং।

এবার পঞ্জাব আর কোনো তর্ক করলো না—গুমরে মরলো শুধু মনে মনে, আর বিশ জোয়ানের সঙ্গে সমান পাল্লায় কাজ করে চলল।

ধিয়ান সিংয়ের জমির ফসল লখা সিং দেবীর এক ফর্দ অনুযায়ী গ্রামের গরীব দুঃখীর মধ্যে বিলি করে দিয়ে বাকীটুকু পাঠিয়ে দিলে ভাইনি আশ্রমে।

এদিকে ঝাড়াই-মাড়ায়ের পর দেখা গেল—ফসলে ঘর ভরে গেছে পঞ্জাব সিংয়ের।

লখা সিং হেসে বললে, ‘রাখবে কোথায় ভাই সাহেব?—নতুন গোলা বাঁধো।’

পঞ্জাব’ সিং চটে বলল, ‘কেন, গুরুজীর আশ্রমে আমি পাঠাতে পারি

না? তোমার কী ধারণা—আমি জমিদার বন্‌বো! ভুলে যেওনা—আমিও একজনকুকা।'

লখা সিং হাসল। বলল, 'তুমি বড চটে যাও ভাই সাহেব। আমি তা বলিনি।'

হ্যাঁ, পঞ্জাব সিং চটে গেছে। মনে মনে গর্‌গর করতে লাগল।

কিন্তু সে রাগ ক্ষণিকের। পরে সারা মন ভরে নামলো বড় করুণ বিষন্নতা। লখা সিংয়ের দল কাজকর্ম মিটিয়ে এক্‌দিন চলে গেল গ্রাম ছেড়ে। ক'দিন তবু ওই ক্ষেত-খামারের কাজে তার উঠোন আর ঘর কলরবে গম্‌গম্ করতো। তারা চলে যাওয়ার পর সব যেন শূন্য হয়ে গেল—শূন্য হয়ে গেল পঞ্জাব সিংয়ের মনের ভেতরটাও। আর কোন অবলম্বন নেই—সঙ্গী নেই। দিন রাত আর তার যেন কাটে না। মনটা খাঁ খাঁ করে। কিসের জন্যে বেঁচে থাকা? কেবলি মনে পড়তে থাকে উধম সিংয়ের মুখটা—মনে পড়ে তার সেই কচি দেহের পরশ—তার সেই খিল্ খিল্ হাসি। ছোট ছেলেটাকে যদি দেবী দিত—আর সে কিছু চাইত না। একলা ঘরে তার মন আর টেকে না।

একদিন সকাল সকাল আশপাশের গাঁ চুঁড়ে চার চারটে বয়েল গাড়ি জুটিয়ে আনল। ঘর-ভরা থাক্ দেওয়া গম-বাজরার বস্তা চাপালে গাড়িতে। বিজলীর পিঠেও চাপিয়ে দিলে খানিক। তারপর হুকুম দিলে গাড়োয়ানদের, 'চলো ভাইনী আশ্রম।'

বিজ্‌লী পথ চিনে গেছে। সে চলল আগে আগে। সে এখন জেনে গেছে —এ গাঁ থেকে লাহোরের পথে আর নয়।

ভাইনীতে পৌঁছতে পৌঁছতে সূর্য উঠে গেল চাঁদির ওপর। গুরুদ্বারের সামনে এসে দেখল পঞ্জাব সিং—সামনের মাঠটুকু ভরে গেছে গাড়িতে গাড়িতে—থরে থরে সাজানো বস্তা-বোঝাই বাজরা গম জোয়ার যব। সে শুধু একা নয়। এ রাজস্ব -খাজনা নয়, দাবী-জুলুম নয়—ছোট বড় 'নামধারী' ব্রতচারীর খয়রাৎ। এ খয়-রাতেই চলে আশ্রমের কাজ, সদাব্রতী মস্ত লঙ্গরখানা।

পঞ্জাব সিং সারবন্দী গাড়ির এক জায়গায় নিজের গাড়ির কাছে বসেছিল প্রায় পাহারা দিয়ে। আশ্রমের এক কুকা কর্মীকে দেখে তড়িঘড়ি উঠে গিয়ে বললে, 'অনেকক্ষণ বসে আছি ভাই সাহেব—আমার মালগুলো একটু খালাসের ব্যবস্থা কর।'

'সব পর পর হচ্ছে ভাই—দেখছ না, কত গাড়ি!' কর্মীটি বললে, 'সব মেপে মেপে জমা পড়ছে। তোমার ডাক পড়লে যেয়ো। এখন এই রোদে বসে আছ

কেন ? যাও ঘোড়াটাকে ছেড়ে দাও—দানাপানি খাক। তুমিও যাও কুয়োতলায় —হাতমুখ ধুয়ে জলপানি খাও লঙ্গরখানায়।'

হুঁশিয়ার পঞ্জাব সিং। বললে, 'আমার এই চার গাড়ি।'

কর্মীটি হেসে বললে, 'ডরো মত ভাই সাহেব—আমাদের লম্বরদার তা জেনে নিয়েছে। তোমার খয়রাৎ আর কারুর নামে জমা পড়বে না পঞ্জাব সিং।'

পঞ্জাব সিং লজ্জা পেল। এ লোকটিও দেখা যাচ্ছে তার নাম পর্যন্ত জানে। হবে—হয়তো সেই ছেলেচুরির ঘটনায় আশ্রমের সকলেই চিনে গেছে তাকে। অথবা আরও আগে থেকে—আরও আগের সব ঘটনা তার জীবনের, সবাই জানে ··· সবাই জানে : সে একটা খারাপ লোক, সে এ আশ্রমের অযোগ্য লোক !···

পঞ্জাব সিং একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে বিজ্‌লীর পিঠে যে বস্তাটা সেটা নামাল। লাগামটা জড়িয়ে বেঁধে দিলে তার পিঠের ওপরে। কিন্তু ঘোড়ার দানাপানি যে কোথায় পঞ্জাব সিং জানে না। বললে, 'যা মাঠে ঘাস খা।'

বিজ্‌লী আস্তে আস্তে এগিয়ে গেল মাঠের দিকে। পঞ্জাব চলে গেল কুয়োতলার দিকে।

বিজ্‌লী মাঠে চরতে চরতে এগিয়ে গেল আশ্রমের পিছন দিকে। দেখতে পেল—সেখানে স্বজাতি স্বগোত্রের মেলা বসে গেছে যেন !

সেখানে ঘোড়া উট ভৈঁস বলদে গিস গিস্ করছে। নানা বোঝা নানা দিক থেকে তারা বয়ে এনেছে। তাদের জন্যে লম্বা তাগাড় তৈরী করা পাথর দিয়ে। কোথাও ছোলার দানা, কোথাও ঘাস, কোথাও জল।

একদিকে লঙ্গরখানার মস্ত রান্না ঘর। সেখানে আশ্রমের মহিলা কর্মীরা নানা কাজে ব্যস্ত। কোথাও হচ্ছে গম বাজরা পেশাই, কোথাও কোটা আনাজের স্তূপ। কোথও সুগন্ধে ম' ম' করছে জোয়ার গমের সেঁকা রুটি।

দানার গন্ধে ক্ষুধার্ত বিজ্‌লী এক-পা এক-পা করে এগিয়ে গেল খাবার তাগাড়ের দিকে।

ওদিকে আশ্রমের সামনের দিকে মানুষজনের ভিড়।

কত দূর দূর গাঁ থেকে এসেছে সব মানুষ তাদের ফসলের বোঝা নিয়ে। আশ্রমের এক অংশে তা ওজন হচ্ছে। জমা লিখছে হিসেব-রক্ষক। বাইরে কুয়োতলায় গাছের ছায়ায় বসে দলে দলে মানুষ গল্পগুজব করছে। ওদিকে লঙ্গর খানাতেও ভিড়—পাত পেড়ে খেতে বসেছে হরেক গাঁয়ের হরেক জাতের মানুষ।

এমনি চলছে ক'দিন।—সন্থ ফসল ওঠার কাল। সবাই নিয়ে এসেছে অন্ন বিস্তর। এটা কুকা সম্প্রদায়ের আশ্রমকে স্বেচ্ছাদান—যে যতটুকু পারে। এত মানুষের কলরবের মাঝখানে পঞ্জাব সিং শুধু একা। কারুর সঙ্গে ভালো করে সে মিশতেও পারছে না—দুটো ভালো মন্দ কথাও বলতে পারছে না।

মুখ শুকনো, নিঃসঙ্গ এই মানুষটা একবার বুঝি চোখে পড়েছিল বিহঙ্গম নারায়ণ সিংয়ের। নারায়ণ শুধিয়েছিল, 'খাওয়া হয়েছে তো পঞ্জাব?'

'হাঁ জী' পঞ্জাব বলেছিল, 'কিন্তু আমার বস্তাগুলো কখন যে ওজন হয়ে জমা পড়বে…'

'দেখছ তো কত লোকের ভিড়।' কাজে ব্যস্ত নারায়ণ সিং আশ্বাস দিয়ে বলেছিল, 'একটু ধৈর্য ধরে বসো পঞ্জাব। তোমার পালা এলেই ডাক পড়বে।' বলতে বলতে চলে গেছে নারায়ণ।

সূর্য যখন ঢলে পড়েছে পশ্চিম দিগন্তে তখন ডাক পড়লো পঞ্জাব সিংয়ের। ওজন জমার হিসেব মিটিয়ে আশ্রমের বাইরে এসে সে সামনের মাঠে বিজ্‌লীর খোঁজ করলো। কোথায় বিজ্‌লী! মাঠের এপাশ ওপাশ সে চোখ চালিয়ে দেখল—কোথাও তাকে দেখা গেল না। অথচ এই মাঠেই তো সে ঘাস খাওয়ার জন্য তাকে ছেড়ে দিয়ে গিয়েছিল!

মাঠে কোথায় তাকে পাবে পঞ্জাব—বিজ্‌লী তখন বহাল তবিয়তে অন্যখানে।

দানার তাগাড়ে আরও অনেক ঘোড়ার সঙ্গে মিশে গিয়েছিল বিজ্‌লী—দানা খাচ্ছিল এক মনে। এমন সময় একটি আধ পরিচিত গলা চিৎকার করে উঠেছিল:

'আরে … বিজ্‌লী!'

কান খাড়া হয়ে উঠেছিল বিজ্‌লীর। ঘাড় ঘুরিয়ে দেখেছিল। চিনতে তার ভুল হল না—কিছু দিন আগে মালিকের কোলে দেখেছে সে ওকে। পিঠে নিয়ে ছুটেছে ছোট্ট একটা তুলোর পুঁটলি। আর সেই কচি গলার খল্ খল্ হাসি।

বিজ্‌লী সাড়া দিল—'চিঁ হিঁ হিঁ' … তারপর এক পা এক পা ক'রে এগিয়ে গেল উধমের দিকে।

আশ্রমের আরও কয়েকটি বাচ্চা জুটেছে সেখানে। বিজ্‌লী খাড়া এসে দাঁড়াল উধমের সামনে—ঘাড় নামিয়ে মাথা বাড়িয়ে দিলে উধমের দিকে।

উধম ওর মাথায় হাত বুলিয়ে দিলে—কেশর টেনে দিলে। বললে, 'সেলাম করো—সেলাম।'

বিজ্‌লী সামনে দুটো পা মুচড়ে হেঁট হলো।

বাচ্চার দল খল্ খল্ হেসে উঠল।

'বাস্।…এবার সিধা খাড়া হো।' উধমের তর্জনী তুলে হুকুম।

বিজ্‌লী সামনের দু'পা তুলে দাঁড়াল।

বাচ্চার দলে হৈ হৈ পড়ে গেল।

উধম্ সঙ্গীদের বলল, 'আরও বহুৎ খেল্ জানে বিজ্‌লী।… বিজ্‌লী, নাচো তো … এ্যাইসা' … উধম একই জায়গায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পা তুলে তুলে নাচ দেখালো। সঙ্গে সঙ্গে বিজ্‌লীও।

'বাস্ বাস্। এখন দৌড় দেখাও—যাও, ছুটো …' সোজা আঙুল তুলে উধম দেখিয়ে দিলে মাঠ প্রান্তরের দিকে।

বিজ্‌লী ছুটল।

পেছন থেকে উধম চেঁচিয়ে বললে, 'বিজ্‌লী … বিজ্‌লী, ফি'রে আসবি।' …

খানিক বাদেই বিজ্‌লী আবার ছুটতে ছুটতে ফিরে এলো। বাচ্চার দল আবার কলবর করে উঠ্‌ল।

'তুমি খুব ভালো বিজ্‌লী।' উধম বিজ্‌লীর গলা চুলকে দিলে।

লঙ্গরখানার রান্না ঘরের দিকে আসতে আসতে থম্‌কে দাঁড়াল দেবী—এক লহমায় দেখে নিলে বাচ্চাদের মাঝখানে বিজ্‌লীকে। ডাকল দেবী, 'উধম—চলে এস।'

'ওকে দুটো রুটি দাও মা—' উধম ছুটে গেল দেবীর দিকে, 'ও আমাদের অনেক খেলা দেখিয়েছে।'

উধম্‌কে অনুসরণ করে এবার বিজ্‌লীর চোখ ফিরলো দেবীর দিকে। এ বুদ্ধিমান প্রাণীটির পলক মাত্র দেরি হলো না দেবীকে চিনে নিতে—সহসা এক উত্তেজনায় যেন কেঁপে উঠল ওর গলা:

'চিঁ হিঁ…হিঁ…'

বুঝি বলতে চাইল—এতদিন কোথায় ছিলে তুমি মালিকানী!

বিজ্‌লী এগিয়ে গেল দেবীর দিকে—সোজা গলা বাড়িয়ে দিয়ে মাথা ঘষতে লাগলো দেবীর কাঁধে। … আগে তো এমনিই হতো! তাই বুঝি সে বলতে চাইলো—দাও, সেই আগের মতো একটু গায়ে হাত বুলিয়ে দাও মালিকানী।

দেবী হঠাৎ যেন পাথর হয়ে গেল। শুধু রুদ্ধ গলায় অস্পষ্ট কণ্ঠে একবার উচ্চারণ করলো, 'বিজ্‌লী!'

এই সময়ে ঘোড়া খুঁজতে খুঁজতে এসে হাজির পঞ্জাব সিং। গোটা দৃশ্যটা তার চোখে পড়ল—মাথায় গেল রক্ত চড়ে। সামনে পড়ে ছিল উটে খাওয়া

ডালপালা। তারই একটা তুলে নিয়ে ছুটে গেল সে বিজ্‌লীর দিকে—পিটোতে লাগল সপাসপ্‌ :

'বেতমিজ··কাহে তু ইধার আয়া, কেন ··· কেন ··· এসেছিস ! আমার কেউ নাই এখানে ··· উল্লু ! কেন তুই এখানে।'—

বিজ্‌লী দেবীর পেছনে আড়াল হতে চাইল। কিন্তু পঞ্জাব ওর লাগাম ধরল টেনে। সমানে সপাসপ্‌ পেটাতে লাগলো।

উধম মাকে জড়িয়ে ধরে চিৎকার করে কেঁদে উঠল :

'ওকে মারছে কেন মা ! ··· ওকে মারছে কেন ! তুমি বারণ কর। মা, তুমি বারণ কর।'

দেবী পাথর।

টেনে হিঁচড়ে মারতে মারতে বিজ্‌লীকে নিয়ে চলে গেল পঞ্জাব।

সূর্য তখন অস্তমিত প্রায়—পঞ্জাবের গ্রাম প্রান্তর অরণ্য পাহাড় জুড়ে ধীরে ধীরে নেমে আসছে অন্ধকার।

সেই মিন্‌ মিনে আলোয় মাঠপ্রান্তর ভেঙে এক সওয়ার চলেছে একা। সে পঞ্জাব সিং। ঘোড়াটাকে জোর কদমে আজ আর ছুটোচ্ছে না—আলগা করে ছেড়ে দিয়েছে লাগামের রশি। বিজ্‌লী চলেছে আস্তে আস্তে। অন্ধকার ঘনিয়ে আসছে সামনে।

সেই অন্ধকার প্রান্তর ভেঙে ভেসে আসে একটা বিষণ্ণ গানের সুর—

'ক্যায়সে দিন গুজরান্‌ করে মালেক—'

'আমার বাবা একদিন উন্মুক্ত কৃপাণ হাতে ঘোড়া ছুটিয়ে
চলে গেল শতদ্রু পার হয়ে।
আমার স্বামীও একদিন এমনি ভাবে
পার হয়ে গেল বিপাশা।
আমার ভাই ছিল, ছেলেরা ছিল—
তারাও একদিন পার হয়ে চলে গেল
ইরাবতী, চন্দ্রভাগা, বিতস্তা।
পাঁচ নদীর পার থেকে কেউ আর ফিরে এলো না।
খাঁ খাঁ করে শূন্য গ্রাম—শূন্য ঘর আমার।
সন্ধ্যা নামলো শতদ্রু পারে।···

কোন কুকা-বিহঙ্গম চারণ গান ধরেছে কোথায়—সঙ্গে ক্ষীণ বীণের ঝংকার :

'ক্যায়সে দিন গুজ্‌রান্‌ করে মালেক !'···

অন্ধকারে আকাশের দিকে তাকিয়ে স্থির কঠিন চোখের কোণ বেয়ে আজ দু'ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়ল পঞ্জাব সিংয়ের : কেমন করে দিন কাটায় সে হে বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের অধিপতি ! হা-হা করছে তার পিম্পল গাঁও ··· খাঁ খাঁ করছে তার ঘর। বিজ্‌লীর কেশরে আস্তে আস্তে হাত বুলিয়ে বিড় বিড় করে বললে, 'কখনো তোকে মারিনি বিজ্‌লী—আজ মেরেছি ··· আমাকে মাফ করে দিস। শুধু তুই আমার বেটা, তুই আমার বন্ধু, তুই আমার দুঃখ দুর্দিনের সাথী !'

ইন্ধন

॥ ১ ॥

ইংরেজদের দফ্‌তরে কুকাদের অনেক খবর জমা হয়ে উঠছে ধীরে ধীরে। গোপন রাষ্ট্রদ্রোহিতার নানা খবর! আম্বালার কমিশনার কর্ণেল আর. জি. টেলর গভর্নরকে এই সময়ে দীর্ঘ এবং বিস্তারিত এক রিপোর্ট দাখিল করে অভিমত দিল—রাম সিংকে অবিলম্বে কারাগারে পাঠানো হোক। টেলর সাক্ষী প্রমাণ দিয়ে জানাল:

'করদ রাজ্য পাতিয়ালার বুদ্ধিমান ও বিচক্ষণ মন্ত্রী আব্দল নবী খান এবং মৌলভী রজ্জব আলির নিকট হইতে সতর্ক হইবার কথা শুনিয়াছি। ··· আমার দৃঢ় বিশ্বাস এই কুকারা আজ হোক কিংবা দু'দিন পরে হোক—আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিবেই। আমাদের সরকারকে তাই সাবধান হইতে বলি। ··· অগণিত জাঠ কুকার মধ্যে আমাদের লুধিয়ানা একেবারে অরক্ষিত।'

তখনকার বড়লাট লর্ড লরেন্স দু'খানা চিঠি পেলেন ডোনোভান নামে এক রেল কর্মচারীর কাছ থেকে। কুকাদের নানা খোঁজ খবরের কথায় ঠাসা। ডোনোভান লিখল:

'··· আগামী বছরের প্রথম দিকেই অভ্যুত্থান হইবার সম্ভাবনা। উহারা অসভ্য এবং ঈশ্বরহীন জীব—ইহা জানিয়াই লৌহদণ্ড লইয়া উহাদের শাসন করা উচিত।··· এমন সময় শীঘ্রই ঘনাইয়া আসিতেছে যখন তরোয়ালে উহারা খৃষ্টানদের গলা কাটিবে। ··· উহাদের আন্দোলনের যে ধরন তাহা ভারতবর্ষে আগেও হইয়া

গিয়াছে, মোগলদের সময়ে। ঠিক ইহাদের মতই অতীতে উহাদের গুরু গোবিন্দ সিংহও জনশক্তি এবং অর্থশক্তি সংগ্রহ করিয়াছিল।'

গুজরানওয়ালার ডেপুটি সুপারিনটেনডেণ্ট অফ পুলিস তার রিপোর্টে জানাল :

'ব্রহ্ম সিং গুরু রাম সিংয়ের প্রধান এক সুবা। তাহার কার্যকলাপ সাংঘাতিক ধরনের। কুকা শিষ্যদের সে বলিয়া বেড়াইতেছে—এখন মসদোর তৈরি করিও না, কাহাকেও টাকা ধার দিও না, নিজেদের কাছে যতটা সম্ভব নগদ টাকা পয়সা রাখ। যুদ্ধের জন্যে প্রস্তুত থাক। ··· এই ব্রহ্ম সিং সিপাহী বিদ্রোহের এক দাগী সিপাহী, কুকার দলে ভিড়িয়া ধার্মিকের ছদ্মবেশ লইয়াছে।'

নানা সূত্রে নানা খবর এসে জমা হতে লাগল। ইংরেজের টনক নড়ে উঠল। সদর দফতরে একদিন ওই খবরের পাহাড়ের উপর বসে কথা হচ্ছিল আম্বালার কমিশনার আর লুধিয়ানার ডেপুটি কমিশনারের মধ্যে।

কমিশনার সাহেব বলল, 'এই জাতগুলোর মনের গড়নই আলাদা। ওদের খুব গর্ব—ওরা শুধু সৈনিকের জাত, ওরা শুধু বীর।'

ডেপুটি সাহেব সক্ষোভে বলে উঠল, 'সিপাহী-বিদ্রোহের সময়কার ওদের সে বীরত্ব ভেঙে গুঁড়ো করে দেওয়া হয়েছিল। কোম্পানী ভেবেছিল—যাক, এই বেয়াদপ জাতটাকে ঠাণ্ডা করা গেছে। কিন্তু ক'বছর যেতে না যেতেই আবার এই দেখুন।'—

কমিশনার সাহেব বলল, 'শুনেছি—রাম সিংকে শিখ সম্প্রদায়ের সবাই মানে না, তাছাড়া শিখ ছাড়া অন্য সম্প্রদায়ের হিন্দুরাও আছে—তারাও ওর ধর্ম মানে না। কিন্তু এখন দেখছি—পঞ্জাবের সবাই এখন ওই একটা লোকের পেছনেই ছুটছে।'

'ওর ধর্ম কর্ম একটা ছল স্যার।'—ডেপুটি সাহেব বলল, 'আমাদের মুণ্ডু কাটার জন্যই সবাই ওকে মানে। দেখছেন না—এখন লুধিয়ানা ছাড়িয়ে সারা পঞ্জাবে ওর প্রভাব কত! ওকে এখুনি গারদে ঢোকাবার ব্যবস্থা করুন—আর দেরি নয়। আপনি ছোটলাটকে বলুন।'

'কিন্তু কোন অজুহাতে ধরা হবে?'—কমিশনার ভাবিত হয়ে বলল, 'একটা মোক্ষম কারণ চাই তো! প্রকাশ্যে ও ওর চ্যালাদের নিয়ে ধর্মকর্ম করে। এ অবস্থায় যদি ধার আর আইনের ফাঁক দিয়ে যদি বেরিয়ে যায় তাহলে আমাদের খুব লজ্জার ব্যাপার হবে।'

ডেপুটি সাহেব বলল, 'একটু উসকে দিন না স্যার—রাম সিংয়ের চ্যালাগুলো খুব গোঁড়া। ধর্ম সম্পর্কে ভয়ানক স্পর্শকাতর। এখানে জোরদার মুসলমান

সম্প্রদায় তো আছেই। থানাদার আবু হোসেনের রিপোর্টটা একবার মনে করুন স্যার।'

কমিশনার সাহেব শুধু একটা 'হুম্' শব্দ করে চুপ করে গেল।

পঞ্জাবের শীর্ষস্থানীয় আমলারা তখন বোধ করি হিন্দু পঞ্জাবীদের ওই দুর্বলতম জায়গাটারই একটা মাপজোপ করছিল—বেরিয়ে এল সেটা ক'দিনের মধ্যেই। হঠাৎ দেখা গেল—লাহোর, অমৃতসর, লুধিয়ানায় মুসলমানরা পথে-ঘাটে গো মাংস ফিরি সুরু করে দিয়েছে। এতদিন ওটা নিষিদ্ধ ছিল। নিয়ম ছিল কেবল মাত্র কসাই-খানাতেই বিক্রি হতে পারবে। হঠাৎ সে সব উল্টে গেল। হিন্দু ও শিখের পবিত্র সহর অমৃতসরে মুসলমানরা হঠাৎ খুলে বসলো কাঁচা চামড়ার কারবার। মন্দির ও গুরুদ্বারের ধূপ ধুনো গুগ্‌গুল চন্দনের সুবাস ছাপিয়ে ছড়িয়ে পড়লো কাঁচা চামড়ার পচাটে দুর্গন্ধ। ভৈঁস বলদের গাড়ি বোঝাই হয়ে প্রধান সড়কের ওপর দিয়ে চলতে লাগলো সারি সারি চামড়ার বাণ্ডিল। সে-সব কিনে বিলাতে চালান দেওয়ার জন্য হাজির হলো ফিরিঙ্গী ব্যবসায়ীর দল।

সমস্ত সম্প্রদায়ের হিন্দু শিখ চঞ্চল হয়ে উঠলো। অবিলম্বে এসব বন্ধ করার লিখিত আবেদন নিয়ে পুলিস সুপারের কাছে হাজির হলো সহরের সাধারণ মানুষ।

ফিরিঙ্গী পুলিস সুপার হাঁকিয়ে দিলে সকলকে, বলল, 'তোমরা কি চাও—আমরা ব্যবসা বন্ধ করিব! তোমাদের মত ধুঁকিয়া ধুঁকিয়া মরিব!'

'এতদিন তো ও ব্যবসা সহরের বাইরে হত সাহেব। আমরা তো তাতে আপত্তি করিনি। সিপাহী বিদ্রোহের পর থেকে সেইরকম আইনই তো হয়েছিল।'

পুলিস সুপার বলল, 'ভুলিও না—এ দেশ আমরা অধিকার করিয়াছে। সহরের ভিতর বাহির আমাদের সমান। সেরেফ্ ভাগিয়া যাও—নতুবা সব বন্দী করিব।'

উস্‌কানির উপর উস্‌কানি। হর মন্দিরে ঘটে গেল দ্বিতীয় ঘটনা। এক বৈশাখী মেলায় হাজার হাজার দর্শনার্থী যখন এসে জড়ো হয়েছে—তখন দেখা গেল মন্দিরের ভেতরে কে কখন একটা গোরুর হাড় ফেলে গেছে। ভাই দেব সিং সকলকে ডেকে ডেকে দেখাল।

এর পাল্টা ঘটনা ঘটতে দেরি হলো না। একদিন সকালে দেখা গেল—চার-চারটে মুসলমান কসাইয়ের দেহ পড়ে আছে রাস্তায়।—

সজাগ হয়ে এবার রুখে এল ফিরিঙ্গীর বিচার-বোধ। অমৃতসরের শিখ ও হিন্দু এলাকাগুলো ডুবিয়ে দিলে পীড়নের বন্যায়। থানাদার নির্বিচারে কয়েকজন কুকাকে বন্দী করে আসামী হিসেবে খাড়া করে দিলে ইংরেজ বিচারকের সামনে।

ম্যাজিষ্ট্রেট জিজ্ঞেস করল, 'এ খুন যে তোমরা কর নাই—তাহার প্রমাণ দাও।'

আসামীরা নীরব।

ম্যাজিস্ট্রেট আবার জিজ্ঞেস করল, 'তোমরা ওই দিন রাত্রে যে অমৃতসরে ছিলে না—তাহার প্রমাণ দাও।'

আসামীদের কোনো উত্তর নাই।

ম্যাজিস্ট্রেট হুংকার দিল, 'জবাব না দিলে তোমাদের সকলেরই ফাঁসী হইবে।'

আসামীরা তখনো নীরব।

ম্যাজিস্ট্রেট রায় দিল—যেহেতু আসামীরা নৃশংস অপরাধের অভিযোগ সম্পর্কে কোন জবাব দিতে পারে নাই—তাই সকলকে ফাঁসীর হুকুম দেওয়া হইল।

ফাঁসীর দণ্ডাজ্ঞা মাথায় নিয়ে নীরবে নেমে এল চার কুকা আসামী।

ভাইনীর আশ্রমে এ খবর এসে পৌঁছতে দেরি হলো না। চঞ্চল হয়ে উঠলো গুরু রাম সিং। ঘরের দরোজা বন্ধ করে তার একান্ত পার্শ্বচর সুবা প্রতিনিধিদের নিয়ে বসল আলোচনায়।

'এ কাণ্ড কে বাধাল? বলো—আমার প্রস্তুতির আগে কারা সব ভেস্তে দিতে চায়? বোকার মতো ফিরিঙ্গীর এ প্ররোচনায় কারা আমাকে জড়াতে চায়?'

আসল অপরাধীদের নাম জানা গেল—বেলা সিং, ফতে সিং, হাকিম সিং ও লেনা সিং। সবাই কুকা।

রাম সিং বলল, 'এখুনি গিয়ে তাদের আত্মসমর্পণ করতে বল। নিরপরাধীরা ফাঁসী যাবে—এ কখনো হতে পারে না।'

একটি প্রতিবাদ কেউ করল না। অমৃতসরে গিয়ে আত্মসমর্পণ করল কুকা বেলা সিং, ফতে সিং, হাকিম সিং ও লেনা সিং। উল্টে গেল ইংরেজের সাজানো মামলা—কিন্তু ফাঁসীর দড়ি যেমনকার তেমনি রইল। বদলে গেল শুধু গলাগুলো। ফাঁসী হয়ে গেল ওই চারজন কুকার।

লাহোর অমৃতসরের জনচিত্ত ভেতরে ভেতরে বাঁধভাঙা বন্যার মতো ফেঁপে ফুঁসে উঠল।

পরের উস্‌কানি খাস লুধিয়ানায়। রায়কোটের গুরুদ্বারে ঘটলো একই ব্যাপার। সেই গোরুর হাড়—সে কাক-চিলেই ফেলুক আর মানুষেই ফেলুক, কুকারা উঠল খেপে। একদিন দেখা গেল—দু'জন কসাই মরে পড়ে আছে রাস্তায়, জনা সাতেক মারাত্মক আহত অবস্থায় ধুঁকছে।

এবার সরাসরি বন্দী হলো জনা সাতেক কুকা। ইংরেজের বিচার এবং দণ্ড

যেন আলমারীর তাকে তোলাই ছিল—শুধু ঘোষণা করার যা অপেক্ষা ইংরেজ বিচারক রায় দিলে: ফাঁসী। বিচারকেরা সব ফাঁসীর হুকুমে বড় দড়।

ফাঁসীর আগে দিনের পর দিন অত্যাচার চালিয়ে নানা জেরার কৌশলে বন্দী এই কুকাদের কাছ থেকে ফিরিঙ্গী রাজ কর্মচারীরা বার করে আনলো বিরাট এব উত্থানের প্রস্তুতি-চিত্র। কাবাল, গোয়ালিয়র, কাশী, নেপাল, জম্মু, কাশ্মীর পর্যন্ত তা বিস্তৃত। শুধু তাই নয়—দেশীয় রাজ্যের সেনা বাহিনী—এমন কি, খাস ফিরিঙ্গীদের বাহিনীর মধ্যেও তৈয়ার হ'য়ে আছে হাজার হাজার কুকা মতাবলম্বী শেষ ডাকের জন্য যারা প্রস্তুত।

এই সাত কুকার মধ্যে ছিল একজন অত্যন্ত সক্রিয় কর্মী—গিয়ানী রত্তন সিং। রায়কোটের সুবা। বিবৃতি আদায়ের জন্য তার ওপর শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত চললে পীড়ন। ফাঁসীর মঞ্চে উঠে ক্রোধে ফেটে পড়ে সে ইংরাজ কর্মচারীকে চিৎকার করে বলেছিল, 'শুনে রাখ—আমি আবার ফিরে আসব আমার জাঠমায়ের বুকে—ফিরে আসবো প্রতিশোধ নিতে।...তোমাদের মৃত্যু ও পতনের দেরি নেই। আমর আবার জন্ম নেবো, সেদিন ফয়সালা করবো কৃপাণের মুখে—ধ্বংস করবো তোমাদের রাজত্ব।...'

ইংরেজ কর্মচারী মুখটিপে শুধু হেসেছিল।

কুকারা দাঁতে দাঁত চেপে তাকায় ওদের গুরুর দিকে—বুকের ভেতরে গুমরে মরছে রত্তন সিংয়ের অন্তিম ঘোষণা।

রাম সিং অসীম ধৈর্য নিয়ে শুধু নাকি বলেছিল, 'ধৈর্য্য ধরো—অপেক্ষা করো। সময় এখনো হয়নি।'

অধীর কণ্ঠে এক সুবা বলে উঠেছিল, 'কবে হবে সময়? ফাঁসীর পর ফাঁসী হয়ে যাচ্ছে আমাদের সহযাত্রী সহযোদ্ধা বন্ধুদের।'

ওরা মনে মনে ছটফট করতে লাগল।

অশিক্ষিত কিন্তু বড় ধর্মভীরু জাত এই জাঠেরা। ওদের নানা কিম্বদন্তী, পূর্বতন গুরুদের নানা নির্দেশ ও ভবিষ্যৎ বাণী ওদের অমূল্য ধনের মতো। দুর্দিন ঘনিয়ে এলে ওরা শক্তি ও আত্মবিশ্বাস সংগ্রহ করে সেই প্রাচীন ভাণ্ডার থেকে। আজও সেই শক্তি ও বিশ্বাস সংগ্রহের জন্য কুকাদের কেউ ছুটল বড় তীর্থ প্রহ্লাদ সাগর, কেউ ছুটল বিকানীরের সোহাওয়া মন্দিরে।

প্রহ্লাদ সাগর মস্ত সরোবর—তার পাশে প্রাচীন এক মন্দির, সেখানে রক্ষিত আছে গুরু গোবিন্দের ভবিষ্যৎ বাণীর পুথি। একদল কুকা সেখানে গিয়ে জেনে

এল ঃ ১২শ গুরুকে খৃষ্টান রাজা নির্বাসনে পাঠাবে এবং শিখদের যারা কষ্ট দেবে তারা ধ্বংস হবে।

বিকানীরের সোহাওয়া মন্দিরের কিংবদন্তীও বড় অদ্ভুত। মন্দিরের সামনে মস্ত এক জামগাছের ওপরে গজিয়েছিল এক খুদে অশ্বত্থ চারা। কিংবদন্তী বলে—ওই অশ্বত্থ গাছ বড হয়ে যেদিন জামগাছকে সম্পূর্ণ ঢেকে দেবে—সেদিন ফিরিঙ্গীর শাসন থেকে মুক্ত হবে ওদের পাঁচনদীর ধোয়া পবিত্র ভূমি পঞ্জাব।

··· সেই অশ্বত্থ গাছ এখন ঢেকে ফেলেছে জাম গাছকে।

আর দেরি নয়!···

বিদ্যুতের মতো এই খবরগুলো ছড়িয়ে পড়ে লুধিয়ানা থেকে আম্বালা, ফিরোজপুর, লাহোর, অমৃতসর—গ্রামে গ্রামান্তরে। এবার প্রস্তুত হও!

সুবা ব্রহ্ম সিংয়ের এলাকার কুকারা জমি-জমা পর্যন্ত বেচতে সুরু করে দিল, কেউ বেচল গোরু ভেড়া ভৈঁস। সুবার নির্দেশ—হাতে নগদ টাকা রাখা চাই। সামনে অনিশ্চিত সময়!

এমন দিনে এল তৃতীয় উস্‌কানি।

মালের-কোটলা ছোট্ট এক মুসলমান করদ রাজ্য। সেখানে সকলের চোখের সামনে গো-হত্যা করা হলো।

কুকারা আর সংযত থাকত পারল না। উস্‌কানির পর উস্‌কানিতে এত দিন যে ক্ষোভ জমা হচ্ছিল একটু একটু ক'রে—এবার তা ফেটে পড়ল ক্রোধে। বহুদিনের শুকনো বারুদঘরে যেন আগুন লাগল। জাঠের রক্তে নামল পাহাড়ী বন্যা।

গুরুর নির্দেশের জন্য দলে দলে ছুটল ভাইনীর দিকে। সামনে মাঘী মেলা। সারা পঞ্জাবের কুকারা সেখানে সেদিন এসে জড়ো হবে।

সাপুড়েরা সাপ নিয়ে খেলা দেখায়। খোঁচা খেয়ে বিষাক্ত গোখ্‌রো খাড়া করে তুলে ধরে তার ভয়ংকর ফণা। সাপুড়ে সাপের ডালার ঢাকনাটা দুলিয়ে দুলিয়ে সাপকে আরও উত্তেজিত করে তোলে। যেমনি সাপ ছোবল্ মারতে আসে অমনি ঢাকনাটা এগিয়ে দেয় তার ছোবলের মুখে। সাপের শত্রু কামড় খায় না —খায় বেচারা ঢাকনা।

পঞ্জাবে সাপুড়ে সেই ইংরেজ—আর ঢাকনা হলো বেচারী মুসলমান কসাই। ক্রুদ্ধ কুকা-গোখরোর উদ্যত ফণার সামনে কৌশলী ইংরেজ বার বার সেই ঢাকনাটা এগিয়ে দিল। আসল শত্রু থেকে গেল নিরাপদ দূরত্বে।

সেবার মাঘীমেলার উৎসবে জড়ো হয়েছে সহস্রাধিক কুকা। এবারে আর

উৎসবের মেজাজ নেই—সবাই গর্ গর্ করছে রাগে। সকলের মনে এক কথা – প্রতিশোধ চাই।

কিন্তু ওদের গুরু তখনো নীরব—অচঞ্চল।

মিছিল করে এসে পড়ল পাতিয়ালার হীরা সিং, লেহ্না সিংয়ের দল—কেউ ঘোড়ায়, কেউ হেঁটে, প্রায় কুচ্কাওয়াজ করে। ক্ষিপ্ত কুকার দল। চিৎকার করে বলে উঠল, 'গিয়ানী রত্তন সিংয়ের বদ্লা চাই ··· মালেরকোটলার বদলা চাই। আমাদের বহুৎ সাচ্চা কর্মী, বহুৎ ভাই একে একে ফাঁসীতে ঝুলেছে।'

সারা মেলা উত্তেজনায় চঞ্চল হ্য়ে উঠল।

মেলার ভাব-গতি বোঝবার জন্য এসেছে থানাদার আবু আর তার পুলিসের দল। তারা তফাতে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে নজর রাখতে লাগল।

হীরা সিং উচ্চ কণ্ঠে গুরু গোবিন্দ সিংয়ের 'জাফরনামা' থেকে আবৃত্তি করে বললে :

'সুখ মনতঁ করসংগ্ দুর্মত্ হরণংগ্।
জই তেগংগ্ শ্রীজয়ী তে গংগ্॥

জয় হোক কৃপাণের—ভাইয়া, নিষ্পাপের সে সেবা করে—সাফ করে পাপকে। আজ জয় হোক আমাদের কৃপাণের। চলো—কে যাবে পাপকে সাফ করতে।'

ভারি একটা গোলমাল বেধে উঠল মেলায়। সহসা বহু কণ্ঠে প্রতিধ্বনি উঠল, 'জয় হোক কৃপাণের।'

'আমরা যাবো!'

'আমরা যাবো!'

'বদ্লা চাই!'

বহুকণ্ঠের সোরগোল পড়ে গেল একটা।

অধীর হয়ে ছুটে এল ওদের গুরু। বলল, 'শান্ত হও। এখনও সময় হয়নি। ধৈর্য ধরো।'

'সময় হয়েছে।'—ক্ষিপ্ত হীরা সিং বলল, 'গুরু তেগবাহাদুরের স্বপ্ন দেখেছি আমি। তাঁর নির্দেশ - সময় হয়েছে।'

কে একজন বলে উঠল, 'সোহাওয়া মন্দিরের জাম গাছ ঢাকা পড়ে গেছে অশ্বত্থ গাছে। সময় হয়েছে।'

আর একজন বলল, 'বড় তীর্থের বাণী বলে—তোমার নির্বাসন। আমাদের দেহে যতক্ষণ প্রাণ আছে তা আমরা হতে দেবো না। সময় হয়েছে বৈ কি।'

উস্কু-খুস্কু চুল—পাগ্লা পাগ্লী চেহারার দুটি মেয়েকে দেখিয়ে হীরা সিং

হেঁকে বললে, 'কী বোঝাবে—কী সান্ত্বনা দেবে এই দুটো মেয়েকে? এরা একজন বাপকে হারিয়েছে, একজন হারিয়েছে স্বামীকে ফিরিঙ্গী জল্লাদের হাতে। দেখ—ওরাও এসেছে আমাদের সঙ্গে বদ্‌লা নিতে।'

লেহ্‌না সিং তার কৃপাণ আস্ফালন করে বলল, 'পহেলা বদ্‌লা মালের-কোটলা।'

উত্তেজিত বহু কণ্ঠে ধ্বনি উঠল, 'চলো কোট্‌লা।'

আবু হোসেন এগিয়ে এল রাম সিংয়ের দিকে। বলল, 'এই কি তোমাদের ধর্মকর্ম? এসব হচ্ছে কি?'

রাম সিং বলল, 'ওরা মস্তানা হয়ে গেছে—ক্ষেপে গেছে।'

'ওদের ঠাণ্ডা করো—না হলে পরিণাম ভাল হবে না।'

ভাল যে হবে না—রাম সিং তা ভাল করেই বুঝেছে। নিজের ঘরে দরোজা বন্ধ করে রাম সিং পরামর্শ করতে বসলো তার অভিজ্ঞ বিবেচক সুবা প্রতিনিধিদের সঙ্গে।

সুবারা একমত: মেলার সব কুকা আজ ক্ষেপে গেছে। তাদের আটকানো বা শান্ত করা অসম্ভব।

রাম সিং তাদের মনে করিয়ে দিলে—গুরুচরণ সিং যে চিঠি নিয়ে গেছে তা এখনো রাশিয়ার মাটিতে গিয়ে পৌঁছায়নি।

সুবারা বললে, 'পারলে আপনিই ওদের থামাতে পারেন।'

রাম সিং গিয়ে দাঁড়ালো ক্ষ্যাপা কুকাদের সামনে। নিজের পাগড়ি খুলে গলায় জড়িয়ে জোড় হাত করে বলল, 'আমার সব আয়োজন তোমরা নষ্ট করে দিয়ো না। হয় শান্ত হও—না হয় এখান থেকে চলে যাও।'

ক্ষিপ্ত হীরা সিং বলল, 'যাবো—মালের-কোটলায় বদ্‌লা নিতে যাবো। আশ্রমের লঙরখানা থেকে আমাদের কিছু খেতে দেওয়া হোক। তাকেই আমরা তোমার আশীর্বাদ বলে মনে করবো।'

হীরা সিংয়ের দোসর লেহনা সিং বলল, 'আর আমাদের কিছু ঘোড়া দরকার। আশ্রম থেকে কিছু ঘোড়া দেওয়া হোক?'

রাম সিংয়ের মুখ কঠিন হয়ে উঠল। বলল, 'আশ্রমের লঙরখানায় খাওয়া তোমরা পাবে। কিন্তু ঘোড়া একটাও পাবে না।'—বিরক্ত হয়ে রাম সিং চলে গেল ওদের কাছ থেকে। আবু হোসেনকে গিয়ে বলল, 'ওরা মস্তানা হয়ে গেছে—ওদের আমি শান্ত করতে পারলাম না। তুমি সদরে জানিয়ে দিতে পার—তারা যা হোক ব্যবস্থা করুক। ওরা আর আমাদের কেউ নয়।'

আবু হোসেন একটু মুখ টিপে হেসে বলল, 'তুমি ওদের গুরু। এতদিন ধরে

ওদের খ্যাপালে। এখন তুমি কেউ নয় বললে কি চলে।'

এই সময়ে হীরা সিং হাঁক দিয়ে বলে উঠল, 'ভাই সব, কে যাবে আমাদের সঙ্গে—কে হবে দোসর, এগিয়ে এসো।'

লেহ্না সিং উন্মুক্ত তরোয়ালের ডগা দিয়ে মাটিতে লম্বা একটা দাগ টেনে বলল, 'যে আমাদের দোসর হবে—পার হয়ে চলে এসো এই দাগ।'

একে একে, তারপর দলে দলে খ্যাপা তরুণ কুকার দল পার হয়ে চলে গেল সেই দাগ। প্রায় শ'দেড়েকের মত হবে।

স্তব্ধ চোখে চেয়ে চেয়ে দেখল রাম সিং—চেয়ে রইল তার প্রধান প্রবীণ সুবারা। হঠাৎ এই রকম একটা ব্যাপারে থ' হয়ে ভিড়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে বিহঙ্গম নারায়ণ সিং। হঠাৎ সে চমকে উঠল পঞ্জাব সিংকে দেখে। পঞ্জাব সিংও এগিয়ে যাচ্ছে সেই দাগের দিকে।

নারায়ণ সিং পেছন থেকে তার কাঁধে হাত রাখল। চাপা গলায় বলল, 'পঞ্জাব সিং—তুমি! কোথায় যাচ্ছ?'

গলায় পঞ্জাব সিং শুধু বলল, 'দাগের ওপারে।'

'ভুল করছ পঞ্জাব সিং। প্রাণ দেওয়ার সময় এখনও হয়নি। বড় উদ্যোগ নষ্ট করে দিয়ো না।'

'জানি না।'—পঞ্জাব সিং শুধু বলল, 'দেবীকে বলে দেবেন—আমি বিল্লি নয়। প্রাণ দিতে জানি।'

নারায়ণ সিংয়ের হাতটা ঠেলে দিয়ে পঞ্জাব সিং সেই তরোয়ালের ডগায় আঁকা দাগ পার হয়ে চলে গেল।

রাম সিংয়ের মুখ কঠিন—পাথর। সেখানে নীরব নিষেধ। তাকে অমান্য করার সাহস হলো না সকলের। বাকি মেলার ভিড় স্তব্ধ চোখে চেয়ে রইল দাগের ওপারের মানুষগুলোর দিকে।

মেলার উৎসবের মেজাজ গেল ভেঙে। নেমে এল একটা বিশ্রী নীরবতা।

মাঘ মাস। পঞ্জাবের হাড় কাঁপানো শীত। তার ওপরে সন্ধ্যে থেকে বাদলা। হাওয়ার ঝাপটা সাঁ সাঁ করে খাঁ খাঁ প্রান্তরে—যেন ভূতুড়ে কান্না। জমাট ঘুট্ঘুটি অন্ধকার—সবটা যেন কালো কম্বলে ঢাকা। এমন দিনে শেয়াল কুকুরও বাইরে বেরোয় না।

আশ্রমের লঙরখানায় খাওয়া দাওয়া সেরে সেই দুর্দিন মাথায় করে হীরা সিং লেহ্না সিংয়ের নেতৃত্বে বেরিয়ে পড়ল খ্যাপা কুকার দল। পেছনে সেই পাগ্লী গোছের দুটি মেয়ে—হাতে তাদের তীক্ষ্ণ ধার টাঙি।

সকলের সঙ্গে অস্ত্র নেই।

হীরা সিং বলল, 'ঘাবড়াও মৎ ভাইয়া। পহেল আমরা মালোধ যাব—ওখান থেকে ঘোড়া এবং অস্ত্রশস্ত্র জোগাড় করে মালের-কোটলা আক্রমণ করব। মালুম হয়—মালোধের বহুৎ কুকাও আমাদের সঙ্গে যোগ দিতে পারে। তাছাড়া আশ-পাশে আছে নাভা, ঝিন্দ্, পাতিয়ালা। মালের-কোটলার ব্যাপারে বহুৎ কুকা খেপে আছে। গিয়ানী রত্তন সিংয়ের বদ্‌লা চায় তারা।'

লেহ্‌না সিং সোৎসাহে ধ্বনি দিয়ে উঠল, 'মালের-কোটলাকো খতম করো।'…

প্রান্তরের নিঃসীম অন্ধকারে রাগে গর্‌গরানো একটা গর্জন হঠাৎ তরঙ্গ তুলে ধীরে ধীরে কোথায় মিলিয়ে গেল।

থানাদার আবু হোসেনের হাব-ভাব রাম সিংয়ের ভাল লাগেনি। কি জানি —এই কটা হঠাৎ খেপে ওঠা লোকের জন্য আঘাত এসে পড়তে পারে তার গোটা দলের ওপর। তাই তার নিজের ডাকহরকরা মারফৎ খবর পাঠিয়ে দিল ফিরিঙ্গীদের সদরের ঘাটিতে। সদর খবর পেল ঠিক—কিন্তু ওই 'মস্তানাদের' আটকাবার কোনে ব্যবস্থাই করা হলো না। লুধিয়ানা থেকে না গেল পুলিস—না গেল ফৌজ। শুধু নিঃসাড়ে ধুরন্ধর ডেপুটি কমিশনার কোয়েন কোথায় যেন চুপি সাড়ে সফরে বেরিয়ে গেল।

কোনো বাধা না পেয়ে খ্যাপার দল যেন আরও খেপে গেল। ওই হিম বাদল মাথায় করে ছুটে চলল মালোধের দিকে। ওখানকার জায়গীরদার এক শিখ সর্দার। হীরা সিংয়ের আশা ছিল—ওখান থেকে সংগ্রহ করবে অস্ত্র এবং ঘোড়া। কিন্তু সুবিধে হলো না। কোয়েন আগেই টেলিগ্রামে সর্তক করে দিয়েছে।

চেয়ে যখন সাহায্য পাওয়া গেল না—তখন জুলুম। ওই দেড়'শ খ্যাপা কুকা হীরা সিংয়ের ইঙ্গিতে ঝাঁপিয়ে পড়ল সর্দারের ঘোড়াশাল আর অস্ত্রগারের ওপরে। বেধে গেল ছোটখাটো একটা লড়াই। হীরা সিং হটবার লোক নয়। শেষ পর্যন্ত কিছু প্রাণ দিয়ে এবং কিছু প্রাণ নিয়ে, উপরি কিছু অস্ত্রশস্ত্র ও ঘোড়া সংগ্রহ করে মালোধ ছেড়ে ছুটলো মালের-কোটলার দিকে। সে-ও প্রায় একদিন এক-রাতের পথ!

পরের দিন সন্ধ্যের মুখোমুখি ওরা এসে পড়ল মালের-কোটলার সীমান্তে। কোটলা দুর্গের চুড়ো তখন অন্ধকারে ঢাকা পড়েছে। দূর থেকে দেখা যায়—নগর-প্রাচীর বেষ্টন করে আলোর ঝিকিমিকি।

হীরা সিংয়ের দল থম্‌কে দাঁড়াল।

লেহনা সিং বলল, 'আজকে কি ওদের কোনো পরব?'

হীরা সিং চোখ কুঁচকে দেখছিল। বলল, 'মালুম হচ্ছে—ও পরবের রোশনাই নয়। ওই দেখ, আলোগুলো নড়াচড়া করছে।'

পঞ্জাব সিং বলল, 'মশাল মালুম হচ্ছে।'

মশালই বটে। এখানেও কোয়েন টেলিগ্রাম করে জানিয়েছে আগেভাগে। কোটলা প্রস্তুত হয়েছে আক্রমণ ঠেকাবার জন্য।

কোয়েন খ্যাপা কুকাদের পথে বাধা দেয়নি বটে, তবে সতর্ক করে দিয়েছে

পাশাপাশি ছোট বড় সব কটা করদ রাজ্যকে—যায় নাভা, ঝিন্দ, পাতিয়ালায়। তার মতলব আছে। কুকাদের সঙ্গে লড়াই একটা বাধুক—এই তার গোপন বাসনা। তবে সেটা ইংরেজদের সঙ্গে না হয়ে—হোক ওদের লোকদের মধ্যেই।

হীরা সিং বলল, 'কাছাকাছি রুর গাঁ—ওখানে বহুৎ জাঠের বাস। দু-চার-জন আমাদের কুকাও আছে। ওখানে আমি কোটলার খোঁজখবর নিতে যাচ্ছি। লেহনা সিং, তুমি সকলকে নিয়ে কোট্‌লার জঙ্গলে গিয়ে ঢোকো।'

হীরা সিং ঘোড়া ছুটিয়ে চলে গেল খোঁজখবর নিতে। লেহ্‌না সিং দলবল নিয়ে কোটলা সীমান্তের জঙ্গলে গিয়ে ঢুকল।

বৃষ্টিটা অপাতত থেমেছে কিন্তু আকাশ মেঘে ঢাকা। উত্তুরে হাওয়ার ঝাপটা বিঁধছে গিয়ে হাড়ে। জঙ্গলের ভেতরে যেন আরও ঠাণ্ডা। বৃষ্টিভেজা গাছপালার হিমেল নিঃশ্বাসে লোকগুলো যেন জমে যেতে লাগল। মালোধের পর একদিন একরাত কেটে গেছে, পেটে কিছু পড়েওনি। হীরা সিং আশ্বাস দিয়ে-ছিল—'মালের-কোটলার বাজার লুঠ করে খাব।' কিন্তু কোথায় বাজার—কোথায় মালের-কোটলা! ক্ষুধার্ত কুকার দল জঙ্গলের অন্ধকার থেকে এক দৃষ্টে তাকিয়ে রইল কোটলার জ্বলন্ত মশালগুলোর দিকে।

অনেক্ষণ পরে ফিরে এল হীরা সিং। সঙ্গে এসেছে চারজন কুকা। দু'জনের হাতে দু'ধামা মাত্র ভুট্টার খই।

হীরা সিং বলল, 'কোনো রকম একমুঠ করে খেয়ে রাতটা কাটাও ভাইয়া। দুশমনরা সারা রাত শহর পাহারার ব্যবস্থা করেছে। ওদের সৈন্য দিয়ে সারা সহর ঘিরে রেখেছে। মালুম হচ্ছে—ভোরের দিকে সুযোগ পাবো।'

হীরা সিংয়ের অনুমান ঠিক।

পুবের আকাশে একটু আলো ফোটবার সঙ্গে সঙ্গে খড়্গ সিং উঠে পড়ল একটা উঁচু শাল গাছের ওপরে। সেখান থেকে স্পষ্ট দেখা যায় ছোট্ট কোটলা শহর, নগরী বেষ্টন করা দীর্ঘ পাঁচিল—তার জীর্ণ ভেঙে পড়া অংশগুলো। সৈন্যসামন্ত, সশস্ত্র নাগরিকরা পাহারায় ছিল সারা রাত—ভোরের সঙ্গে সঙ্গে চলে যাচ্ছে পাহারার জায়গা থেকে। মশালগুলোকে মাটিতে ঘষে ঘষে নিভিয়ে ফেলছে। ভোরের আলো যতো পরিষ্কার হয়ে উঠতে লাগল—ততোই কোটলা যেন ঝিমিয়ে পড়ল। পথ-ঘাটে চলন্ত মানুষও আর দেখা যায় না। হঠাৎ যেন দিনের আলোয় কোটলায় নিঃসাড় রাত নামল।

সারারাত জেগেছিল ওরা কুকাদের আক্রমণ রুখবে বলে। ওরা ভাবল:

কুকারা যখন এল না—হয়তো চলে গেছে অন্য দিকে। মালের-কোটলার মানুষ ঘুমুতে গেল।

খ্যাপা কুকার দল এ সুযোগ আর হাতছাড়া করল না। বেরিয়ে পড়ল জঙ্গল থেকে। নগরে ঢোকার সামনের পথ ছেড়ে ওরা ছুটলো নগরবেষ্টনীর ভাঙা অংশ-গুলোর দিকে চোখ রেখে। ছোট ছোট নানা দলে ভাগ হয়ে ঢুকে পড়ল শহরে। হীরা সিং লেহ্‌না সিংয়ের মতো যে সব কুকা এ সহরের নাড়ি-নক্ষত্র জানে তারা নিল দলের নেতৃত্ব। প্রথম আর্তনাদ উঠল কসাই পাড়া চিড়িমারে। সেদিকে লোকজন ছুটতে না ছুটতে আর্তনাদ উঠল অস্ত্রাগারের প্রহরীদের মুখে। মুগুরের বাড়িতে, টাঙি পরশু কৃপাণ আর সড়কির মুখে দেখতে দেখতে কোটলা শহরে মৃতদেহের স্তূপ জমতে লাগল—বিশেষ করে কসাই পাড়ায়।

আচমকা আঘাত সামলে উঠে তৈরী হলো কোটলার সেনাবাহিনী। গর্জে উঠল ওদের দুটো কামান—গর্জে উঠল গাদা বন্দুক। কোটলার মৃতদেহের ওপর পড়তে লাগল কুকাদের মৃতদেহ। কুকাদের চেয়ে ওদের অন্তত পাঁচগুণ বেশী প্রস্তুতি, লোকবল অনেক বেশী। কুকারা যেটুকু সুযোগ পেয়েছে—সে ওই প্রথম দিকে। তারপর কুকারা ছিন্ন ভিন্ন হয়ে যেতে লাগল।

হীরা সিং চিৎকার ক'রে উঠল, 'এবার হটো।'

ওরা হটে গেল। কিছু আহত কুকা ছটফট করছে রাস্তায় পড়ে, কিছু আহত হয়ে ছিটকে পড়েছে ঘোড়া থেকে। জল্‌দি তাদের ঘোড়ায় তুলে নিয়ে ওরা ঘোড়া ছুটিয়ে চলে গেল রুরের দিকে।

কিন্তু রুর তখন জনশূন্য। লড়াইয়ের খবর পেয়ে রুর গাঁয়ের মানুষজন সবাই ভয়ে পালিয়েছে গাঁ-ঘর ছেড়ে।

হীরা সিং বলল, 'গাঁয়ের ভেতরে থাকা ঠিক নয়—ওরা পেছু ধাওয়া করে আসতে পারে। জঙ্গলে ঢোক।'

রুরের এ গহন অরণ্য পাতিয়ালা রাজ্যের এলাকা। ওরা জঙ্গলে গিয়ে ঢুকলো।

ঝড়ে ভাঙা জাহাজ যেন ভিড়ল অজানা বন্দরে। হাল ভেঙেছে, পাল ছিঁড়েছে, এটা বেঁকেছে—ওটা চুরেছে। অক্ষত প্রায় কেউ নেই। সকলের জামাকাপড় রক্তে যেন ছোবানো। যে কজন আহত সঙ্গীকে ওরা বয়ে এনেছে কোটলা থেকে—ঘোড়া থেকে নামাতে গিয়ে দেখা গেল, বেশীর ভাগই ইতিমধ্যে মরে শক্ত হয়ে গেছে। ধুপ্‌ ধুপ্‌ করে তাদের লাসগুলো গড়িয়ে পড়ল মাটিতে। তিনটে বেঁচে আছে—ধুঁকছে। তাদের মধ্যে একজন পঞ্জাব সিং। ঘোড়া থেকে নামাবার

পর সে দাঁড়িয়ে দাঁড়য়ে টলতে লাগল। তারপর নিজেই আস্তে আস্তে শুয়ে পড়ল মাটিতে। কামিজ ভিজে গেছে রক্তে।

লেহ্‌না সিং জহির সিংয়ের দিকে তাকিয়ে অস্ফুট আর্তনাদ করে উঠল। বলল, 'সর্দার-তোমার কামিজের ডান হাতা থেকে টস্‌টস্‌ করে রক্ত চুইয়ে পড়ছে যে!'

'ওটা নেই ভাইসাহেব।' জহির সিং ডান হাতটা তুলে দেখাল—কব্জি থেকে উড়ে চলে গেছে।

একজন তরুণ কুকা নিজের কামিজ ছিঁড়ে কাটা হাতটা শক্ত করে বেঁধে দিল।

কিন্তু কটা বাঁধবে? কাকে বাঁধবে? অক্ষত নেই কেউই।

একজন আহত কুকা মাটিতে শুয়ে পড়েছিল—গোঙিয়ে উঠল যন্ত্রণায়। অস্ফুট কণ্ঠে বলে উঠল, 'একটু জল ভাই সাহেব ...'

সুস্থ কুকারা মুখ চাওয়া-চাওয়ি করল শুধু।

কোথায় জল! এ শুখা জঙ্গলে জলের চিহ্নও নেই।

ওরা সবাই বসে পড়েছে মাটিতে। কেউ কথা বলছে না আর—যেন সব কথা আপাতত ফুরিয়ে গেছে। অরণ্যের পাতা খসে পড়ার শব্দটিও কানে এসে লাগে।

মাটিতে নিঃসার পড়ে আছে পঞ্জাব সিং চোখ বুজে। মাঝে মাঝে যন্ত্রণায় কুঁচকে উঠছে ওর মুখ। একবার সে ঘোলাটে চোখ মেলে তাকাল—সকলের মুখের দিকে তাকিয়ে কি যেন খুঁজল, কি যেন মনে করবার চেষ্টা করল। তারপর আস্তে আস্তে ডাকল, 'বিজ্‌লী!'

অদূরে দাঁড়িয়ে ছিল ওর ঘোড়া। এ ক'দিন সে-ও কোনো দানাপানি পায়নি। পেটের জ্বালায় বনের ঘাস পাতা টেনে টেনে খাচ্ছিল। ডাক শুনে উৎকর্ণ হয়ে উঠল জানোয়ারটা। তারপর আস্তে আস্তে এগিয়ে এল পঞ্জাব সিংয়ের কাছে। একেবারে মুখ ঝুঁকিয়ে দিল পঞ্জাব সিংয়ের মুখের কাছে।

পঞ্জাব সিং ওর মুখে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বলল, 'বিজ্‌লী বেটা—তোকে একলা ফিরতে হবে। সেই আশ্রম'—দুর্বল হাতটা নেড়ে দেখিয়ে দিল শুধু। তারপর চোখ বুজল।

ঘোড়াটা শুঁকতে লাগল ওর সর্বাঙ্গ। মুখ ঘসতে লাগল গায়ে। পঞ্জাব সিং আর তাকে কোন আদরও করল না, সাড়াও দিল না।

একজন কুকা গাছের ওপর থেকে এই সময়ে বলে উঠল, 'বহুৎ সিপাহী আসছে সর্দারজী'

লেহ্‌না সিং জিজ্ঞেস করল, 'কোটলা থেকে?'

'না। মালুম হচ্ছে পাতিয়ালার দিক থেকে।'

লেহ্‌না সিং দাঁতে দাঁত চেপে বলে উঠল, 'ফিরিঙ্গীর পা-চাটা কুত্তার দল! আমাদের ধরতে আসছে।' কুকা সঙ্গীদের দিকে তাকিয়ে বলল, 'এই শেষ লড়াই। ওই বেইমানের দলকে খতম করে আজ সবাই মরবো'

হীরা সিং মাথা নাড়লো—বলল, 'না। অসুস্থ যে কটা ধুঁকছে ওদের নিয়ে সবাই চলে যাও। সঙ্গে নিয়ে যাও আমাদের দুই বহিনকে—ওদের নিরাপদে ঘরে পৌঁছে দিও। আমি শুধু ধরা দেবো। আর রইল আমার সঙ্গে এই কটা লাস।'

'সে কখনো হতে পারে না।'—একটি পাগলি মেয়ে ক্ষোভে ফেটে পড়ল—বলল, 'তোমাকে ছেড়ে কোথায় যাবো সর্দার! শেষ লড়াই লড়বো আজ। আমরাও মরতে জানি। আমাদের স্বামী গেছে, ভাই গেছে—ঘরে ফিরে কী করব?'

'না।' —হীরা সিং বলল, 'আর লড়াই করে লাভ নেই বহিন, পাতিয়ালার সিপাই যখন আসছে—ওদের কামান আর বন্দুকও নিয়ে আসছে সঙ্গে। কোটলার দিক থেকেও আসছে নিশ্চয়—আমাদের ঘিরে ফেলবার চেষ্টা হবে। কতক্ষণ টিকতে পারবো? আমাদের কেউ অক্ষত নেই—দেখো। আজ দুদিন ওদের পেটে কিছু পড়েনি। এ জঙ্গলে এক ফোঁটা জলও নেই। কি নিয়ে লড়বো!'—তারপর একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে বলল, 'আমার দুঃখ নেই। মালের-কোটলার বদলা নিতে চেয়েছিলাম—নিয়েছি। আমার কাজ শেষ। আমি ধরা দেবো।'

লেহ্‌না সি বলল, 'তোমাকে ছেড়ে যেতে পারবো না সর্দার।'

'অন্তত এই অসুস্থ চোটলাগা লোকগুলো আর আমাদের দুই বহিনকে নিয়ে কেউ কেউ চলে যাও।' হীরা সিং বলল, 'বৈদ্য দেখালে বাঁচতে পারে।'

মরতে মরতে দেড়শ' এখন ঠেকেছে জনা নব্বইতে। তারমধ্যে লুধিয়ানার জনা কুড়ি জোয়ান কুকা বাছাই করে লেহ্‌না সিং হুকুম দিল, 'তোমরা চলে যাও। আমাদের বদ্‌লা নিয়ো। যাও—আর দেরি করো না। সোজা উত্তরমুখো চলে যাবে। জঙ্গলে কাঠুরিয়াদের একটা পথ পাবে। ওই পথে দশ ক্রোশ গেলে লুধিয়ানার সীমানা।'

কুড়িজন কুকা জোয়ান উঠে দাঁড়াল অনিচ্ছায়।

লেহ্‌না সিং হাঁক দিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'ওরা কত দূরে?'

গাছের ওপর থেকে জবাব এল, 'বেশী দূরে নয়।'

'নাও—চোট্‌লাগা সাথীদের ঘোড়ায় তুলে নাও সাবধানে। তেজী ঘোড়াগুলো সব নিয়ে চলে যাও। দেখো—কোন ভাবেই যেন ফিরিঙ্গীদের হাতে না পড়ে।

ওরা এক নম্বর ঘোড়া-চোর। সব ঘোড়া গুরুজীর কাছে জমা করে দিয়ো।··· আর, গুরুজীর কাছে আমাদের হয়ে ক্ষমা চেয়ে নিয়ো'—লেহনা সিং তাড়া লাগালে, 'আর এক দণ্ডও তোমাদের অপেক্ষা করা চলবে না। জলদি।'

আহত অচেতন দেহগুলোকে ঘোড়ায় তুলে বিশ জন কুকা এগিয়ে চলল উত্তর দিকে। বাকি সবাই আত্মসমর্পণের জন্য চুপচাপ বসে রইল গোটা তিনেক লাস নিয়ে। বনের যত মাছি এসে এরই মধ্যে ছেঁকে ধরেছে তিনটে দেহকে। মাটি ফুঁড়ে সার দিয়ে উঠে আসছে মড়া খেকো পিঁপড়ের পাল।

লেহ্‌না সিংয়ের সঙ্গে থেকে গেল পাতিয়ালার আরও ৬৬ জন। কেউ ওদের নেতাদের ছেড়ে যেতে চাইল না। হীরা সিং বলল, 'ঠিক আছে ভাই সাহেব। আত্মসমর্পণ আমরা করব—তবে কিছুক্ষণ লড়বো যতক্ষণ না আমাদের ওই লুধিয়ানার দল নিরাপদ দূরত্বে চলে যায়।'

শেষ গা-ঝাড়া দিয়ে উঠে দাঁড়াল ওরা। ছায়ানিবিড় জঙ্গলের বাইরে মেঘলা থম্‌থমে্ আকাশ যেন স্তব্ধ চোখে চেয়ে আছে পঞ্জাবের গিরি-প্রান্তর অরণ্যের দিকে—তার গ্রাম-গ্রামান্তর আর শহরের দিকে।

আবার বোধকরি জোর একটা বৃষ্টি নামবে।

বড় দুর্যোগের দিন! ···

বিচারের মহিমা

যথা সময়ে মালের কোটলায় কোয়েন এসে হাজির হয়ে গেল। দীর্ঘকায়, দোহারা চেহারার মানুষ—পাদ্রীদের মত মুখ ভরা দাড়ি কিন্তু খয়েরী চোখ দুটো বিপরীত, যেমন রুক্ষ তেমনি পাহাড়ী বাজের মত সন্ধানী আর চঞ্চল—সদাই কি যেন খুঁজছে। অঙ্গে খাকী কুর্তা আর লড়াকু সৈনিকের মত পাৎলুন। মালের-কোটলা মুসলমান-শাসিত ছোট এক স্বাধীন দেশীয় রাজ্য কিন্তু কোয়েনের কাছে তার রাজা উজীর থেকে কাজী মৌলভী পেয়াদা সবাই তটস্থ, তারা এমনই স্বাধীন!

এসেই কোয়েন খোঁজ নিলে—আক্রমণকারী 'রিবেলদের' ধরার কী ব্যবস্থা হয়েছে।

বৃদ্ধ উজীর প্রায় কাঁপতে কাঁপতে এসে হাজির হলো। বললে, 'আমাদের ঘোড়সওয়ার, পদাতিক তাদের তাড়া করে রাজ্যের সীমা পার করে দিয়েছে। তারা পাতিয়ালার এক জঙ্গলে গিয়ে ঢুকেছে হুজুর।' অর্থাৎ এখন যত দায় সব পাতিয়ালার।

কোয়েন হুংকার দিলে, 'তোমরা ঘেরাও করিয়া ধরিতে পার নাই কেন? অনেক আগে তোমাদের খবর দেওয়া হইয়াছিল—কিন্তু তোমাদের এতগুলা লোক মরিল, মার খাইল কেন? আমাদের মহামান্য সরকার বৃথাই টোমাদের সিংহাসনে বসাইয়াছে। অযোগ্য! অপডার্থ!'...

উজীর ঢোক গিলে, চোখ পিট্‌পিট্‌ করে, করুণ গলায় বললে, 'আমাদের শহর

কোটাল আহ্‌মেদখান দুশমনদের অনেককে খতম করে শেষ পর্যন্ত মারা পড়ল হুজুর। আরও বহুৎ সিপাহী লড়াই করে ওদের তাড়িয়ে দিয়েছে হুজুর।'

'উট্টম!' কোয়েন বললে, 'আমরা চাই—উহাদের সব খট্টম কর।'

এমন সময় পাতিয়ালার এক ঘোড়সওয়ার এসে হাজির হলো—হাতে একটা চিঠি। কোয়েনের চিঠি—স্বয়ং মহারাজার লেখা। পত্রবাহক চিঠিটি ধরিয়ে দিলে কোয়েনকে।

চিঠি পড়ে কোয়েন চেয়ার থেকে প্রায় লাফ দিয়ে উঠল—মুখে চোখে এক পৈশাচিক উল্লাস। উত্তেজিত গলায় বলে উঠল, 'ফাঁসী—সব ক'টাকে ফাঁসিতে লটকাইব।' উজীরের দিকে চিঠিটা বাড়িয়ে দিয়ে বললে, রুরের জঙ্গলে রিবেল গুলা ধরা পড়িয়াছে। আহ্, আমাদের যীশুর কী করুণা!' তারপর পত্র বাহককে বললে, 'ছুটিয়া যাও—এখনই সব শয়তান গুলাকে পাঠাইয়া দাও, একটা একটা করিয়া ফাঁসীতে লটকাই। আর তোমাদের নায়েন-নাজীম নিয়াজ আলিকে পাঠাইয়া দাও—রিবেল দল ধরিয়াছে, উহাকে পুরস্কার ডিব।'

উজীরের ফ্যাকাসে মুখেও হাসি, যাক্—বিপদ কেটে গেছে!

দেখতে দেখতে পুরস্কারের কথা মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়ল।

কোয়েন আস্ফালন করে বললে, 'যাও উজীর, জলডী যাও। ফাঁসীর ডোবা প্রস্তুত কর। শতদ্রুর দুই পার, টামাম হিন্দুস্টান টোমাডের জন্য আমরা ঠাণ্ডা করিয়া দিব—হাঁ।'

এমন সময় আরও সব লোকজন এসে কোয়েনের এজলাসে হাজির হতে লাগল। কারণ এরই মধ্যে মুখে মুখে রটে গেছে কথাটা: পুরস্কার। এজলাসের ভেতর থেকে বাইরে—বাইরে থেকে ঘরে ঘরে। তারপর ঘাটে বাটে মাঠে।...পুরস্কার।—কেউ এল ছুটতে ছুটতে, কেউ তাজা ঘোড়া বা পাহাড়ী খচ্চর ছুটিয়ে। এরা সব চৌকিদার, লম্বরদার, কেউবা ছোটখাটো গ্রাম্য জমিদার, সম্পন্ন গৃহস্থ। ওদের মুখে বিদ্রোহীদের সম্পর্কে নানা খবর।

কেউ বললে, 'আমি বিশজন কুকাকে ঘোড়া ছুটিয়ে যেতে দেখেছি।'

কেউ বললে, 'আমি তাদের হাতে রক্তমাখা সমসের দেখেছি।'

কেউ বললে, 'আমি লুকিয়ে লুকিয়ে ওদের কথাবার্তা শুনেছি হুজুর—ওদের মতলব ছিল ওরা আগে কোটলা অধিকার করবে। তারপর রেল লাইন উড়িয়ে আম্বালা লুধিয়ানা বিচ্ছিন্ন করে দেবে। টেলিগ্রাফের তার কেটে দেবে।'

এক জমিদার বললে, 'আমাদের কুয়োতলায় বসে ওরা জল খেয়েছে রাতের বেলা, চাপাটি গড়েছে আগুন জেলে।'

মালোধের মোক্তার বললে, 'ওরা আমাদের ঘোড়াশাল থেকে ঘোড়া চুরি করেছে স্যার।'

সাক্ষীর পর সাক্ষী। কিন্তু কোয়েনের বিচার তো মনে মনে আগেই সারা হয়ে গেছে। তাই চটে গেল। বললে, 'গেট্ আউট্ ··· ভাগো হিঁয়াসে। এত দেখিতে ছিলে তো আগে ধরিতে পার নাই কেন? কাউয়ার্ডস্! গেট্ আউট্—গেট্ আউট। হে—কোন হ্যায়। সবকে আউট করিয়া দরোজা বন্ধ্ কর।'

কোয়েনের সিপাহীরা সকলকে ধাক্কা ধাক্কি করে বার করে দিলে।

কিছু কাচ্চা বাচ্চা নিয়ে এক কোণায় কিছু মেয়েছেলে কান্নাকাটি করছিল। তারা নড়ল না।

কোয়েন হুংকার ছাড়ল, 'উহারা কে?'

'শহর কোটালের পরিবার হুজুর।' এক সেপাই বলল, 'দুশমনদের সঙ্গে লড়াই করে কোটাল আহ্‌মেদ খান মারা গেছে।'

'উট্টম সাহসী আদমি।' কোয়েন বললে, 'উহাদের এখন যাইতে বল। উজীর সাহেবকে বলিয়া উহাদের ভরণ পোষণ দিব।'

এমন সময় একজন সেপাই ছুটতে ছুটতে এসে খবর দিল—পাতিয়ালার নায়েব-নাজিম সৈয়দ নিয়াজ আলি সব বন্দীদের নিয়ে দলবল সহ হাজির হয়েছে।

কোয়েন উৎসাহিত হ'য়ে বললে, 'নিয়াজ আলিকে লইয়া আইস।'

নিয়াজ আলির দল কুর্নিস করে ঘরে ঢুকল।

কোয়েন জিজ্ঞেস করলে, 'সব রিবেল ধরা হইয়াছে?'

'হাঁ হুজুর।'

'কত হইবে?'

'আটষট্টি জন হুজুর।'

'হোয়াট!' কোয়েন অসন্তুষ্ট হয়ে বললে, 'আমি শুনেছি কম সে কম দেড়শ' ছিল। বাকী সব কোথায় গেল?'

'কিছু মরেছে, কিছু এদিক ওদিক হয়তো পালিয়েছে। চিন্তা করবেন না—সব ধরা পড়্‌বে।' নিয়াজ আলি বললে, 'মাত্র তিন ঘোড়সওয়ার ও এই কয়জন সিপাহী নিয়ে এই দলটাকে আমরা ঘেরাও করি।'

'উট্টম! সকলকে পুরস্কার দিব।'

নিয়াজ আলি একজনকে দেখিয়ে বললে, 'এ হ'লো জয়মল সিং—দুশমনদের সম্পর্কে আমাদের প্রথম খোঁজখবর দেয়।

'Oh my friend—আমার বন্ধু ··· আমাদের বন্ধু টোমরা—আইস, বস।'

নিয়াজ আলি আর জয়মল সিং দু'জনের হাত ধরে নিজের দু'পাশে চেয়ারে টেনে বসালে কোয়েন। তারপর একজন সিপাহীকে বললে, 'উজীরকো বোলাও।'

বৃদ্ধ উজীর ছুটতে ছুটতে এসে হাজির হ'লো।

কোয়েন জিজ্ঞেস করলে, 'ফাঁসীর ডোরী প্রস্তুত? আসামী ৬৮ জন।'

উজীর মাথা চুলকে বললে, 'জেলখানায় অত ফাঁসীর দড়ি হবে না হুজুর।'

'হোয়াট!' কোয়েন হুংকার দিয়ে উঠল, 'ডোরী নাই!'

'আমাদের ছোট জেলখানা হুজুর।' উজীর বললে মাথা চুলকে, 'কালে ভদ্রে দু-একটা ফাঁসী হয় মাত্র।'

'এবার বেশী বেশী ডোরী রাখিবে।' কোয়েন সহুংকারে হুকুম দিয়ে বলল, 'এখনো বহুৎ কুকা আছে, উহাদের সকলকে ফাঁসীতে লট্‌কাইব। এখন বলো— তোমাদের কয়টা কামান আছে।'

'ন'টা হুজুর।'

'উট্টম। প্রস্তুত কর। ডোরী নাই তো শয়তানগুলাকে গোলায় উড়াইব।' কোয়েন হুকুম দিল, 'শহরে ঢ্যাঁড়া পিটাইয়া দাও। পাতিয়ালা, ঝিন্দ, নাভা, কাপুরটলার রাজাদের জরুরী খবর পাঠাও—তোমাদের প্যারেড গ্রাউণ্ডে যেন হাজির থাকে। টোমাদের সিপাহী গোলন্দাজদের প্রস্তুত হইতে বল। সহরবাসী সকলকে উপস্থিত থাকিতে বল। যাও।'

কিছুক্ষণের ভেতরেই সুরু হয়ে গেল ঢোল সহরৎ: আজ বিকালে প্যারেড ময়দানে সকলের সামনে ৬৮ জন কুকাকে কামান দেগে উড়িয়ে দেওয়া হবে।

৬৮ জন বন্দী তখন কোটলার জেল হাজতে গাদাগাদি হয়ে ধুঁকছে। অক্ষত কেউ নেই, কেউ কেউ এরই মধ্যে অশ্রান্ত রক্তক্ষরণে নেতিয়ে পড়েছে। তারই মধ্যে বসে আছে দুটি মেয়ে—এখনও তাদের দল থেকে আলাদা করা যায়নি।

কোয়েন হুকুম দিলে, 'ওই দুই ডাইনীকে উহাদের গ্রামে পাঠাইয়া দাও। সেখানে উচিত মতো শিক্ষা দিও।'—

কোটলার ঘরে ঘরে দম্‌চাপা একটা উৎকণ্ঠা নেমে এল। পুরুষেরা ফিস্ ফিস্ করে কথা কইতে লাগল, মেয়েরা একেবারে চুপ করে গেল। বাচ্চারা কেউ কাঁদল না—হাসলও না। শুধু কসাই পাড়ায় একটা সরব উল্লাস দেখা গেল। দল বেঁধে তারাই সবার আগে গিয়ে হাজির হলো কোটলার কুচকাওয়াজের ময়দানে।

পড়তি বেলায় সুরু হ'লো ময়দানে সেনাবাহিনীর কুচ্‌কাওয়াজ। ন'টা

কামান সকলের চোখের সামনে দিয়ে টেনে নিয়ে গেল গোলন্দাজ বাহিনী। উৎকন্ঠিত দর্শকের দল চেয়ে রইল ফ্যাল ফ্যাল করে। তারা বোবা হয়ে দেখতে লাগল শাস্তির তোড় জোড়।

সাতটা কামানকে সাজানো হলো সারবন্দী করে—বাকী দুটো সাজানো হ'লো সেনাবাহিনীর ডাইনে আর বাঁয়ে, যেন বিরাট একটা যুদ্ধের অভিযান এখুনি সুরু হবে। তড়ি ঘড়ি এ'সে হাজির হ'য়েছে নাভা, ঝিন্দ, পাতিয়ালার বড় বড় সামরিক অফিসার। কোয়েনকে ঘিরে বসেছে-রাজা, রাজড়া আর উজীরেরা।

কোয়েন হুকুম দিল, 'এবার বন্দীদের আমার সামনে হাজির কর।'

হাত-বাঁধা ৬৬ জন বন্দীকে কোয়েনের সামনে হাজির করা হলো। দু'জন মেয়ে শুধু কমে গেছে দল থেকে। তাদের জবরদস্ত হিঁচড়ে নিয়ে গেছে পাতিয়ালায়। ওরা পাতিয়ালার মেয়ে।

আত্মপ্রসাদে ভরপুর আজ কোয়েন পাদ্রীমার্কা দাড়িতে হাত বুলোতে বুলোতে উপস্থিত সকলকে উদ্দেশ্য করে ঘোষণা করলে, 'এবার তোমরা দেখ—আমাদের রাজ্যশাসনের যাহারা বিঘ্ন সৃষ্টি করে, শান্তি নষ্ট করে তাহাদের কিরূপ শাস্তি আমরা দিই। যাহারা আমাদের সহায়তা করে তাহাদের সহিত কিরূপ আচরণ আমরা করি—তাহাও তোমরা দেখ। এই যে পাতিয়ালার নায়েব-নাজিম সৈয়দ নিয়াজ আলি—যে এই অপরাধীদের বন্দী করিয়াছে, তাহাকে এক হাজার টাকা পুরস্কার দেওয়া হইল। জয়মল সিং—গাইন্দা, তাহাকে দুই'শ টাকা পুরস্কার দেওয়া হইল। লম্বরদার পঞ্জাব সিং দরবারীকে উল্লেখযোগ্য সহযোগিতার জন্য তিনশ' টাকা পুরস্কার। যে সব সওয়ার ও পদাতিকেরা অপরাধীদের কাবু করিয়াছে তাহাদের প্রত্যেককে পঞ্চাশ টাকা পুরস্কার!' কোয়েন একটু থামল, তারপর রাজা উজীরদের দিকে তাকিয়ে বললে, 'আপনারা সকলে আপনাদের রাজ্য হইতে কুকাদের এবার নির্মূল করুন—উহাদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করুন। গ্রাম হইতে ভিটা-ছাড়া করুন।'

রাজা উজীররা সম্মতি সূচক মৃদু হাততালি দিল।

কোয়েন হুকুম দিল, 'এবার সারবন্দী সাতটা কামানের মুখে সাত জন কুকাকে বাঁধ—তারপর কামান দাগ।' কোয়েন বসল।

বন্দী কুকাদের মধ্যে থেকে হীরা সিং বলল, 'আমরা মরার জন্য ভয় পাইনা সাহেব। আমাদের যা কর্তব্য মনে হয়েছিল—তাই আমরা করেছি। আমরা গুরুজীর আদেশও অমান্য করেছি, তার জন্যে তিনি আমাদের ত্যাগ পর্যন্ত করেছেন।

তাতেও দুঃখ নেই। কিন্তু এই রকম বাঁধা হাতে পশুর মত আমরা মরতে চাই না।'

কোয়েন কটমট করে চেয়ে বললে, 'কী চাও তোমরা?'

'আমাদের শেষ ইচ্ছা জানাই সাহেব।' লেহ্‌না সিং বললে, 'আমাদের হাতের বাঁধন খুলে দেওয়া হোক, আমরা কামানের সামনে বুক পেতে দেবো—দাগো তোমাদের কামান। আর মায়েরা বহিনেরা দেখুক—আমাদের সন্তান এবং ভাইয়েরা দেখুক—কুকারা মরতে ভয় পায়না।'

'উত্তম।' কোয়েন দেশোয়ালী প্রহরী সেপাইদের হুকুম দিলে, 'উহাদের বাঁধন খুলিয়া দাও।' রাজা উজীরের দিকে ফিরে বললে, 'দেখ—উহাদের গোস্তাকী এখনও যায় নাই। বড় বদমাস আছে।'

বন্দী কুকাদের বাঁধন খুলে দেওয়া হ'লো।

সুরু হলো শাস্তির পালা।

দেখতে দেখতে এক ক্ষেপ কামান দাগা হয়ে গেল—সাতটা কামানের সামনে দাঁড়ানো সাতজন কুকার দেহ গোলায় ছিন্ন ভিন্ন হয়ে গেল। মুণ্ড, ধড়, হাত-পা, নাড়িভুঁড়ি ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ল সারা ময়দানে।

মালেরি ও আশপাশের দেশীয় রাজ্যের জড়ো হওয়া দর্শকেরা অবাক বিস্ময়ে দেখছে—আবার সাতজন কুকা নির্ভয়ে গিয়ে দাঁড়াল সাতটা কামানের সামনে। গোলন্দাজেরা গোলা দাগার জন্য প্রস্তুত হলো।

এক সময়ে কামান গর্জন করে উঠল। এবার দর্শকেরা চোখ ঢাকল দুই হাতে। চোখ যখন খুলল—তখন কামানের সামনে আর কেউ নেই, শুধু ছড়িয়ে আছে ছিন্নভিন্ন অঙ্গ—কামিজ পাগড়ির শতছিন্ন টুক্‌রো।

ওদিকে বেলা পড়ে আসছে।

কোয়েন চেয়ারে হেলান দিয়ে দাড়িতে হাত বুলোতে বুলোতে বললে, 'চমৎকার হইতেছে। জল্‌দি করো। সন্ধ্যার মধ্যে শেষ করা চাই।'

আবার সাত কুকা গিয়ে দাঁড়িয়েছে সাতটা কামানের মুখে। এবার দর্শকেরা চোখ ঢাকা দিয়ে মাটিতে বসে পড়ল। এবং গোলা দাগার বিকট শব্দের পরে দেখা গেল দর্শকদের মধ্যে কেউ কেউ অজ্ঞান হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়েছে।

এমনি চলতে লাগল দফায় দফায়। এক সময়ে দেখা গেল—পড়ে আছে দর্শক বিরল মাঠ। শুধু বসে আছে কসাই পাড়ার কজন আর কোয়েনের আশপাশে রাজা উজীর—সম্পন্ন সর্দার জমিদার আর কিছু বেদী ও মোহান্তের দল। এক পাশে সেপাই পাহারায় কুকা বন্দীর দল। তাদের মধ্যে একজন অত্যন্ত সন্তর্পণে এতক্ষণ

একটু একটু করে সেপাই পাহারার দৃষ্টি এড়িয়ে বসে বসে একটু একটু করে সরে যাচ্ছিল কোয়েনকে লক্ষ্য করে। সকলের তখন দৃষ্টি নিবদ্ধ কামান দাগার দিকে। কুকা নিহাল সিং তারই সুযোগ নিচ্ছিল একটু একটু করে।

৪২ জনকে গোলায় উড়িয়ে দেওয়ার পর কোয়েনকে ঘিরে হঠাৎ ভারী একটা গোলমালের সৃষ্টি হলো। কুকা নিহাল সিং বোধ করি তার জীবনের শেষ একটা লাফ দিয়ে চেপে ধরলে কোয়েনের দাড়ি। তারপর গলা। দাঁত-চাপা গর্‌গরানির ভেতর থেকে দু-একটা বিচ্ছিন্ন শব্দ শুধু বেরিয়ে এল : 'ফিরিঙ্গী··· শয়তান ···'

সহসা এমন অসম্ভব দুঃসাহসিক একটা ঘটনায় রাজা উজীরের দল বিমূঢ়। তাদেরই পায়ের তলায় গড়াগড়ি যাচ্ছে কোয়েন !

নিহাল সিং কোয়েনের গলা চেপে ধরেছে সবল দুই বলিষ্ঠ জাঠ-হাতে। ছট্‌-ফট করছে কোয়েন—চোখ দুটো বেরিয়ে আসছে ঠেলে। বেরিয়ে গেছে জিভ।

গর্‌গর্‌ শব্দে বেরিয়ে আসছে নিহাল সিংয়ের দাঁত-চাপা শব্দ : 'আমার শেষ বদ্‌লা ··· শেষ বদ্‌লা ··· ফিরিঙ্গী ···'

উন্মুক্ত তরোয়াল নিয়ে ছুটে এল সেনাবাহিনীর অফিসারেরা, সঙীন বাগিয়ে ছুটে এল দেশোয়ালী সৈনিকেরা। দেখতে দেখতে খণ্ড-বিখণ্ড হয়ে গেল নিহাল সিংয়ের দেহ। ময়দানের সবুজ ঘাস রাঙা হয়ে গেল রক্তের ধারায়।

গায়ের ধুলো ঝাড়াঝাড়ি করে কোয়েনকে চেয়ারে ধরে বসিয়ে দেওয়া হলো। কোয়েন হাঁফ নিতে লাগল জোরে জোরে। বেশ খানিক পরে একটু সুস্থ হয়ে আস্তে আস্তে বলল, 'Oh, terrible !··· কী ভয়ংকর ! বাকী গুলোকে জল্‌দি খতম কর—জলদি কর। এবার সকলের হাত বাঁধিয়া কামানে বাঁধ। আর উহাদের বিশ্বাস করিও না।···'

না, বিদ্রোহীদের আর কোন সুযোগ দিল না কোয়েন। পরের সাতজনকে কামানের সঙ্গে বাঁধা হ'লো। গর্জে উঠল কামান। শেষ হলো পঞ্চাশ জন। বাকী তখনো ষোল।

এমন সময় এক গোরা ঘোড়সওয়ার ছুটে এল কোয়েনের কাছে। একটা জরুরী চিঠি নিয়ে আসছে সে লুধিয়ানা থেকে। চিঠিটা ধরিয়ে দিলে কোয়েনের হাতে।

চিঠি পড়ে কেমন মুসড়ে গেল কোয়েন।

রাজা উজীরের দল জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকাল কোয়েনের দিকে।

চিঠিতে উপরওয়ালা কমিশনারের মোটামুটি নির্দেশ : আগে বিচার কর, এজাহার নাও—তারপর ইচ্ছামত দণ্ড দাও।

এখন কার এজাহার নেবে কোয়েন—হীরা সিং, লেহ্না সিংয়ের মত দলের নেতারা তো আগেই খতম !

কোয়েন নীরস গলায় বলল, 'এই রিবেলদের আবার বিচার কী ! টোমাদের ভালোর জন্য আমি যাহা করিয়াছি ঠিক করিয়াছি ! ডেখিলে না—আমি মরিটে বসিয়াছিলাম !' বলে গলায় হাত বুলোতে লাগল কোয়েন।

গোলন্দাজরা পরবর্তী আদেশের জন্য তখন তাকিয়ে আছে কোয়েনের দিকে।

'আজিকার মতো কাজ বন্ড কর। বাকী আসামীদের মালোধে পাঠাও—সেখানে আমার উপরওয়ালা বিচার মোতাবেক উহাদের দণ্ড দিবেন।' এই বলে কোয়েন মুখ ভার করে ময়দান ছেড়ে চলে গেল।

সেদিন সন্ধ্যার পর কোটলায় নিবিড় হয়ে এল শ্মশানের শান্তি। কুচ্‌কাওয়াজের মাঠময় ছড়ানো কুকাদের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ—কিছু বা ঝুলছে গাছের আগায় নাড়িভুঁড়ি কামিজ। কোটলায় নেমে এল বিভীষিকাময় দুঃস্বপ্নের মত একটা রাত।

পলাতক

সেইদিন রাতেই জরুরী তলব দিয়ে কোয়েন ডেকে পাঠাল নায়েব-নাজিম নিয়াজ আলিকে।

তড়িঘড়ি নিয়াজ এসে হাজির।

কোয়েন জিজ্ঞেস করলে, 'রুরের জঙ্গল হইতে কতজন পলাইয়াছে অনুমান কর?'

'বিশ পঁচিশ জন হবে হুজুর।'

'কি রূপে বুঝিলে?'

নিয়াজ বলল, 'হীরা সিংয়ের দলে কিছু নতুন কুকাও ছিল সাহেব—তারা ঠিক পাকাপোক্ত হয়নি। উল্টো পাল্টা কিছু জেরা করতেই অনেক কথাই বলে ফেলেছে।'

'তাহারা কোনদিকে পলাইয়াছে কিছু জানিয়াছ কি?'

'অনুমান হয়—লুধিয়ানার দিকে গিয়ে থাকবে। কারণ দলটা লুধিয়ানার।'

'Good—very good!' কোয়েন বলে উঠল, 'এখনি গিয়া উহাদের পাকড়াও কর।'

নিয়াজ আলি বিপদ গুণলে। মাথা চুলকে বলল, 'হীরা সিংদের ধরে আনার পর প্রায় একরাত একদিন কেটে গেছে হুজুর। ওদের কি আর রুরের জঙ্গলে পাব?'

'যেমন করিয়া পার—পাকড়াও কর। তোমাকে আরও পুরস্কার দিব।' কোয়েন বলল, 'আমার পল্টনের লোক চাও—লও। গোলন্দাজ চাও—লও। উহাদের আমার জীবন্ত চাই—এজাহার লইব। আমি উপরওয়ালার কাছে প্রমাণ করিব—ইহা মস্ত বড় একটা চক্রান্ত, ভয়ংকর বিদ্রোহের ইহা একটা অংশ। কিছু কিছু সাক্ষী প্রমাণ আমার কাছে ইহার মধ্যেই আসিয়াছে।'

পুরস্কারের লোভে বেতনভুক সরকারী চৌকিদার, গ্রাম-গ্রামান্তরের সম্পন্ন গ্রাম-প্রধান, লম্বরদার, মুখিয়ারা ইতিমধ্যে অনেক সাক্ষী প্রমাণ কোয়েনের কাছে পেশ করে গেছে। তবে কিনা তারা কেউ আসামী নয়। খাঁটি বিচারের জন্য আসামীদের নিজের মুখের কিছু বিবৃতি চাই।

নিয়াজ আলি পাকা নায়েবে নাজিম। মনে মনে বললে: বড় বড় সাক্ষী প্রমাণ সব নিজেই বেকুবের মত আগেভাগে নষ্ট করে এখন আমাকে জঙ্গলে পাঠাচ্ছ সাহেব!… মুখ ফুটে বললে, 'আমি কিছু মাস্কেট ঘোড়সওয়ার নিয়ে এগোচ্ছি।'

'যাও।' কোয়েন বললে, 'জঙ্গলের ভিতর হইতে উহাদের তাড়া করিয়া বাহির কর। বাকিটা আমি দেখিবে।'

নিয়াজ আলিকে বিদায় করে কোয়েন লম্বা লম্বা টেলিগ্রাম করতে বসল লুধিয়ানায়, আম্বালায় - লাহোরে: ভয়ংকর সব 'বিবেলদের' শায়েস্তা করবার জন্য পল্টন চাই, ঘোড়সওয়ার চাই, গোলন্দাজ চাই। পাতিয়ালার জঙ্গলের উত্তরে লুধিয়ানা বরাবর এখনই কিছু গোলন্দাজের সমাবেশ চাই।

বিদ্রোহীরা আম্বালার প্রধান সেনাশিবিরের সঙ্গে লুধিয়ানার সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে দিতে পারে, খানা-খন্দ খুঁড়ে রাস্তা বন্ধ করে দিতে পারে—লক্ষ্য রাখ। সেই সঙ্গে হুঁশিয়ার করে দিলে পাতিয়ালার সীমান্তবর্তী সমস্ত দেশীয় রাজ্যের রাজাদের: তৈয়ার থাক—একটিও বিদ্রোহী যেন পলাইতে না পারে।

টেলিগ্রামের পালা সেরে কোটলা থেকে একদল সশস্ত্র ঘোড়সওয়ার নিয়ে কোয়েন ছুটে গেল পাতিয়ালা-লুধিয়ানা সীমান্তের দিকে। রাত তখন গভীর।

আকাশে মেঘ জম জমাট: বৃষ্টি নেই—কিন্তু নিবিড় অন্ধকারে দুর্যোগের ভ্রূকুটি। খর বইছে ঘনঘোর শীতের হাড় কাঁপানো উত্তুরে হাওয়া। মাঝে মাঝে এক একটা ঝড়ো ঝাপটে গাছপালার পাতা ঝরে পড়ছে—উড়ে এসে পড়ছে মুখে চোখে। সাঁ সাঁ একটা ভুতুড়ে করুণ কান্নার মতো শব্দ ছড়িয়ে পড়ছে সারা বনভূমিতে। বরফের মতো ভেজা ঠাণ্ডা মাটিতে পা ফেলে ফেলে সারিবদ্ধ হয়ে কাঠুরেদের অনতি পরিসর ফালি রাস্তা ধরে চলেছে বিশ জন কুকা। শ্রান্ত অবসন্ন, পেটে দুদিন কিছুই পড়েনি। ওরা অবসন্ন শুধু দেহে নয়—মনেও। মন ওদের ফাঁকা হয়ে গেছে—হঠাৎ কি যেন সব ওলট পালট হয়ে গেল। এমন পরিণাম ওরা ভাবতে পারেনি।

একজন বললে, 'হীরা সিং বলেছিল—কোটলা থেকে আমাদের আসল লড়াই স্বরু হয়ে যাবে কিন্তু …'

আর একজন বললে, 'ওরা আত্মসমর্পণ করল। শেষ পর্যন্ত কী হল ওদের ?' ওরা জানে না।

লেহ্‌না সিংয়ের নির্দেশিত কাঠুরেদের পথ বেয়ে চলেছে ওরা লুধিয়ানার দিকে। ঘোড়ায় চড়ে যাওয়ার উপায় নেই—মাথার ওপরে গাছের ডালপালার বাধা। ডাইনে বাঁয়েও আগাছা কাঁটার অভাব নেই। ঘোড়ার রশি ধরে চলেছে হেঁটে হেঁটে। নাঙ্গা পা নাঙ্গা গা—শতচ্ছিন্ন রক্তাক্ত কামিজ পাজামা। সামান্য দু'চারটে লাঠি ও বর্শা ছাড়া অস্ত্র শস্ত্র আর কিছুই নেই। ঘোড়ার পিঠে চাপানো পাঁচজন আহত অসুস্থের তিনজন ইতিমধ্যেই শেষ হয়ে গেছে। রশি দিয়ে বাঁধা তাদের লাশ—ছেঁকে ধরেছে পোকামাকড মাছির ঝাঁক। বাকী দু'জনের অবস্থাও ভালো নয়—শেষ হবার আগে ধুঁকছে। পথ ওদের অজানা। কাঠুরেদের আঁকা বাঁকা ঘুরপাক পথ ধরে চলেছে ওরা হাতড়ে হাতড়ে। কখনো ঘুরছে একই জায়গায় ঘুরে ঘুরে।

রাতেও ওরা পথ চলা থামায়নি। সকলের মনে উৎকণ্ঠা একটিই : কখন শেষ হবে এ অরণ্য সীমা।

একজন আপন মনে বলে উঠল ক্লান্ত গলায়, 'লেহ্‌না সিং বলেছিল—বিশ ক্রোশ।'

'এখনো শেষ হলো না।' আর একজন বলল, 'আমরা পথ ভুল করিনি তো !'…

'কি করে বুঝব। আকাশে চাঁদ নেই, তারা নেই।'

'শোন, কার যেন গলা ঘড় ঘড় করছে।'

'কোনও ঘোড়া ?'

'ঘোড়া নয়—আদ্‌মি ভাইয়া।' কে দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে বললে, 'বোধ হয় বাহাদুর সিং শেষ হয়ে যাচ্ছে।'

'চার জন গেল। বাকী এক।'

'আমরা হয়তো কারুকেই জ্যান্ত নিয়ে ফিরতে পারব না।'

'লাসগুলো ফেলে দিলে খানিকটা হাল্কা হতাম।'

'তা হয় না। ভাইনীতে ফিরে ওদের সৎকার করব।'

ভাইনীর উল্লেখে মনে পড়ে যায় গুরু রাম সিংয়ের কথা :

'গুরুজীকে কী বলবে ? মনে পড়ে উনি গলবস্ত্র হয়ে হাত-জোড করে কী বলেছিলেন ?'

'আমার সব আয়োজন নষ্ট করে দিয়ো না—ধৈর্য ধরো, সময় এখনো হয়নি।' কে একজন কথাগুলো—তার প্রত্যেকটি শব্দ একটি একটি করে, স্পষ্ট ক'রে ক'রে উচ্চারণ করে গেল।

তারপর কেউ আর কোন কথা বলে না। সকলেরই কেমন অপরাধী মনে হয়। নিঃশব্দে পথ চলে ঘোড়া আর মানুষ। মনে হয় এখন ওদের উত্তেজনা একেবারে ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। চলছে। ·· ভাবছে। ··· সত্যিই ওরা গুরুর বড় আয়োজনকে পণ্ড করে দিল কী! মনে মনে সঠিক উত্তরটা ওরা খুঁজে পায় না। এই নিরালা নিরন্ধ্র অন্ধকারে হাতড়ে হাতড়ে অজানা অরণ্যে পথ চলার মত ওরা মনে মনে উত্তর খোঁজে। শীতের ঝরাপাতারা ওদের মুখে চোখে ভুতুড়ে খস্ খসে একটা পলকের স্পর্শ দিয়ে কোথায় উড়ে চলে যায়।

হঠাৎ আগের ক'টা ঘোড়া চঞ্চল হয়ে উঠল। জলের গন্ধ পেয়েছে তৃষ্ণার্ত পশু। ছুটে গেল একটা পাথুরে খাদের দিকে। দু'দিন আগের অঝোরে ঝরা বৃষ্টি-ধারার জল জমে আছে—অন্ধকারে কিছুটা ঝক্‌মক্ করছে ধূলোপড়া আয়নার মত। সব ঘোড়া ছুটল সেই জলের দিকে। জলে মুখ লাগিয়ে চোঁ চোঁ শব্দে জল খাচ্ছে জীবগুলো। প্রায় দশ ঘণ্টা ওরা জল খায়নি।

মানুষগুলোও তাই। তারাও ঝুঁকে পড়ল জলের কিনারে। তৃষ্ণার্ত ক্ষুধার্ত পশু আর মানুষ। তবু ঘোড়াগুলো কিছু ঘাস পাতা চিবিয়েছে পেটের জ্বালায়। মানুষগুলোর পেটে দেড় দিন কিছুই পড়েনি। জঙ্গলের বাইরে বুনো গ্রাম চোখে পড়েছে দু-একটা—কিন্তু যেতে সাহস হয়নি।

জল খেয়ে ওরা পাথরের চাতালে বসে পড়ল।

কে একজন বলল, 'আমরা জল খেলাম—মেহের সিংয়ের মুখে একটু জল দাও।'

একজন উঠল। নিজের পাগড়ি খুলে এক প্রান্ত জলে চুবিয়ে গেল ঘোড়ায় চাপানো মেহের সিংয়ের কাছে। অন্ধকারে তার কথাগুলো শোনাল কোনো অশরীরী প্রেতের মত—বলল, 'মেহের সিং শেষ।'···

কে বলে উঠল, 'বাকী রইলাম আমরা···'

ওরা কষ্টসহিষ্ণু জাঠ—তবু শূন্য জঠর ওদের দেহের উত্তাপকে ঘুণপোকার মত কুরে কুরে খেয়ে ফেলেছে। হিন্দুকুশ পর্বতমালার মৃত্যুশীতল অদৃশ্য হাত যেন ওদের গলা চেপে ধরল—যেন এখুনি এই ক্ষুধার্ত অবসন্ন দেহগুলোকে এই বরফের মত পাথুরে চাতালে ফেলে একেবারে শেষ করে দেবে।

'আর নয়—ওঠো। ··· জমে যাচ্ছি।'

সকলে গা ঝাড়া দিয়ে উঠে পড়ল।

পদক্ষেপ শিথিল। পেশীগুলো যেন আর কাজ করতে চাইছে না।

'জঙ্গল কী শেষ হবে না?' কে বিষণ্ণ গলায় বলে উঠল।

কে একজন আশাবাদী বলল, 'আজ রাতেই যদি জঙ্গল শেষ হয়ে যায়—আমরা কি ভোরের অপেক্ষা করবো ?'

'কখনো না। ঘোড়া ছুটিয়ে চলে যাব। তাহলে কারুর চোখে পড়বে না। ভেবো না—আমাদের খোঁজ করছে না দুশমনেরা!'

শুধু খোঁজ নয়—একদল দুশমন ওদের পেছনেই তখন অনুসরণ করে চলেছে শিকারী কুকুরের মত। নিয়াজ আলির দল। আগে আগে মশালধারী ক'জন—ঘোড়ার ক্ষুর ও মানুষের পায়ের অসংখ্য দাগ দেখে চলেছে তারা, পেছনে সশস্ত্র সৈনিকদের সঙ্গে স্বয়ং নিয়াজ আলি, সবার পেছনে ঘোড়ার দল। ওদের পথ চেনা—ওদের কোথাও ঘুরপাক খেতে হয়নি। ওদের মশালের আলোর আভা অগ্রসরমান কুকাদের চোখে পড়েনি। ওদের ক্ষুধার্ত অবসন্ন শিথিল পদক্ষেপের দু'-গুণ বেগে এগোচ্ছে গোস্ত্, রুটিটে পরিপুষ্ট সতেজ পাগুলো। ব্যবধান কমে আসছে ক্রমশ।

ভোর হয়ে এল। জঙ্গলও প্রায় শেষ। এখানে গাছগুলো ফাঁকা ফাঁকা। তার আড়াল থেকে দেখা যায় লুধিয়ানার ছড়ানো প্রান্তর। অদূরে টিলার মত গোটা কয়েক।

কুকারা থমকে দাঁড়াল। জায়গাটা ওরা চেয়ে চেয়ে চেনবার চেষ্টা করল। 'মালুম হচ্ছে—সানেওয়ালের কোথাও হবে। নিখাদ পাহাড়ী প্রান্তর।...'

'কি করা যায় এখন ?'

ছোট ছোট কথায়—ছোট ছোট প্রশ্নোত্তরে কয়েক মুহূর্তের আলোচনা ওদের :

'গ্রাম মনে হয় অনেক দূরে।'

'এখনও ভালো করে ভোর হয়নি।'

'যেতে হলে এখুনি ঘোড়া ছুটিয়ে চলে যাই চলো।'

'কদিন আর না খেয়ে জঙ্গলে পড়ে থাকব ভাইয়া ?'

অসহিষ্ণু, বিদ্রোহের স্বর চড়ে ওঠে :

'আমি চলে যেতে চাই।'

'আমি।'...

'আমি।'...

কেউ আর এক মুহূর্ত এ জঙ্গলে পড়ে থাকতে রাজি নয়।

'তবে চলো। ঘোড়াগুলো ঠিক করো।'

'কিন্তু লাস-বাঁধা ঘোড়াগুলো ?'

'ওগুলো আমাদের পাশে ছুটুক—তেমনি ক'রে বাঁধ। সাথীদের আমরা ফেলে যেতে পারি না।'

ওরা তৈরী হলো। ঝোপ জঙ্গল শূন্য আরও একটু ফাঁকা জায়গায় এসে ওরা ঘোড়া সাজাল। ঘোড়ার পিঠে উঠে বসল।

একজন বলে উঠল, 'আর দেরি কেন? চল।'

ঘোড়া ছুটল। জঙ্গল ছাড়িয়ে প্রান্তরে পড়েছে এবার। সহসা দিগন্তভেদী শব্দ উঠল—বুম্ বুম্। টিলার দিকে ধোঁয়া উঠছে। এক সওয়ার ঘোড়াসুদ্ধ লুটিয়ে পড়ল মাটিতে।

একজন চেঁচিয়ে উঠল :

'জঙ্গলে ··· জঙ্গলে ··· ফিরিঙ্গীর কামান।'

সওয়ারেরা ফিরে এল আবার জঙ্গলের আড়ালে। কিন্তু তাতেও নিস্তার নেই। অশ্রান্ত গোলা এসে পড়তে লাগল জঙ্গলের ভেতরে। কোথাও কোথাও ঝরা পাতায় ধুঁইয়ে উঠল আগুন। বিশ্রী তিতকুটে পাতা পোড়ার গন্ধ। ঘোড়াগুলো ভড়কে গিয়ে জঙ্গলে পেছু হটছে—তাদের যেন আর সামলে রাখা অসম্ভব। সওয়ারেরা নেমে পড়েছে।

একজন বললে, 'ছেড়ে দাও ঘোড়া—জঙ্গলে ঢোকো—জঙ্গলে ঢোকো।'···

মানুষগুলো আবার পেছিয়ে এলো জঙ্গলের গভীরে। গোলা ফাটার শব্দে ভয় পাওয়া লাগাম-ছাড়া ঘোড়াগুলো ছিট্‌কে ছড়িয়ে পড়ল এদিক ওদিক—ক'টা বেরিয়ে পড়ল প্রান্তরে। তাদের দেখাদেখি বনবাদাড় ভেঙে সব ক'টা। ক'টার পিঠে লাগামের দড়ি দিয়ে বাঁধা লাস। তাদের মাঝখানে পঞ্জাব সিংয়ের বিজ্‌লী। প্রান্তরে ছত্রভঙ্গ ঘোড়ার পাল। তবে কামানের লক্ষ্য ঘোড়া নয়—জঙ্গল, জঙ্গলে আশ্রয় নেওয়া মানুষ।

কুকারা দাঁড়িয়েছে এক জায়গায় দঙ্গল বেঁধে—লক্ষ্য ওদের প্রান্তরের সেই টিলাগুলোর দিকে—যেখান থেকে ছুটে আসছে কামানের গোলা। দাঁতে দাঁত পিষছে ওরা, 'ফিরিঙ্গী শয়তান।'

এমন সময় পেছনে এসে দাঁড়াল নিয়াজ আলির দল। হেঁকে বলল, 'হাত তোল।'

কুকারা চম্‌কে ফিরে তাকাল। ওখানে সুসজ্জিত সৈনিকদের হাতে উদ্যত মাস্কেট।

নিয়াজ হেঁকে বলল, 'একটু নড়বার চেষ্টা ক'রো না—একেবারে শেষ হয়ে যাবে। ধরা দাও—হীরা সিংদের মত বাঁচলেও বাঁচতে পারো।'

তা হলে আত্মসমর্পণ-করা হীরা সিংরা বেঁচে গেছে? কুকারা মুখ চাওয়া-চাউয়ি করল।

নিয়াজ হুকুম দিল কয়েকজন সৈনিককে, 'ঘোড়ার লাগামে ওদের বাঁধ। পালাবার চেষ্টা করলে সিধা গুলি করবে।'

বনের বাইরে খাঁ খাঁ করছে শূন্য প্রান্তর। ঘোড়াগুলো শুধু ছত্রভঙ্গ হয়ে কোথায় ছুটে পালাল। প্রান্তরে পড়ে রইল শুধু একটা ঘোড়া আর একজন কুকার মৃতদেহ।

বাকী উনিশজনকে বন্দী করে রওয়ানা দিল নিয়াজ আলির দল।

কে একজন কুকা নিয়াজ আলিকে উদ্দেশ্য করে বলল, 'হীরা সিং, লেহনা সিং—আমাদের আর সব সাথীরা যেখানে সেইখানেই আমাদের নিয়ে চল।'

নিয়াজ আলি একগাল হেসে বলল, 'চিন্তা ক'রো না—সব্বাই সেখানেই যাবে।'

নিয়াজ আলির সাঙ্গ-পাঙ্গদের মধ্যে খুব একটা হাসির রোল পড়ে গেল।

হ্যাঁ, সবাই সেই এক জায়গাতেই যাচ্ছে—কেউ গোলায়, কেউ ফাঁসীতে। বিদ্রোহীদের সম্পর্কে ফিরিঙ্গীরা যেন বিচারের একটা রায়ই জানে—মৃত্যু।

মালোধের ১৬ জনের বিচার-প্রহসনেও ঘটেছে সেই একই রায়।

সামনে রাত

বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ভাইনীব আশ্রমে ক্রমাগত খবর আসছে কুকাদের নিজস্ব ডাকহরকরা মারফৎ। ঘোড়া ছুটিয়ে আসছে একের পর এক।

কোট্‌লায় পঞ্চাশজন খতম্ … মালোধের বিচারে বাকি ষোলজনের ফাঁসী। … লুধিয়ানার সীমান্তে ধরা পড়েছে কোটলার পলাতকেরা—তাদের নিয়ে গেছে আম্বালার দিকে।…

আশ্রমে গুরু রাম সিংকে ঘিরে কিছু না কিছু কুকা নেতা প্রায় সব সময়েই হাজির থাকে। তারা চঞ্চল হয়ে উঠল।

সাহেব সিং গুরু রাম সিংয়ের প্রায় ডান হাত। বলল, 'ওদের এ স্বেচ্ছামৃত্যু, অপঘাত! ওদের কোন দায়িত্ব আমাদের নেই।'

লখা সিং সুবা রাম সিংয়ের দিকে তাকাল জিজ্ঞাসু চোখে। বলল, 'ফিরিঙ্গীরা কী আমাদের আশ্রমে কোনও হামলা করবে না?'

গুরু রাম সিং নির্বাক। চিন্তিত।

ফিরিঙ্গীদের উদ্দেশ্য ওদের কারুরি তখনো জানা নেই। মালোধের হত্যাকাণ্ডে রাম সিংকে তলব করেছিল সেখানে কোয়েন। দেখা হয়নি রাম সিংয়ের সঙ্গে। ওদের ধারনা—হয়তো সে বিষয়ে গুরুজীকে কিছু জিজ্ঞাসাবাদ করতে আসছে ওরা।

সাহেব সিং সুবা বলল 'ওই খ্যাপা মস্তানদের কোনও দায়িত্ব তো গুরুজী নেননি!—স্পষ্টই তো বলেছেন, ওরা আমাদের আর কেউ নয়।'

কিন্তু দেখতে দেখতে নানা গুজব পল্লবিত হয়ে ছড়িয়ে পড়তে লাগল ভাইনীর আশপাশে—গ্রামে গ্রামান্তরে। দল বেঁধে ঘোড়া ছুটিয়ে আসতে লাগল কুকারা—জটলা করতে লাগল রাস্তায় দাঁড়িয়ে। যার যা অস্ত্র আছে তাই নিয়ে ছুটে এসেছে আজ—কে জানে, লড়াইয়ের সূত্রপাত হ'বে কি না ?···

সূর্য মাথার ওপরে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে আরও সব গুরুত্বপূর্ণ খবর নিয়ে হরকরা সওয়ারেরা এসে হাজির হ'তে লাগল ভাইনী আশ্রমে : ফিরিঙ্গী সেনা-শিবিরের খবর। অনেক কুকা তখন ঢুকে পড়েছে খাস কোম্পানীর পল্টনের মধ্যে—তাদের পাঠানো খবর :

জেনারেল টাইটলারের অধীনে প্রস্তুত গুর্খা রেজিমেণ্ট ··· আম্বালা ক্যানটনমেণ্টে প্রস্তুত ফিরিঙ্গী পল্টন ··· লুধিয়ানায় খাস রাজকীয় বাহিনী ··· নাভা ঝিন্দ মালোধ পাতিয়ালায় প্রস্তুত দেশীয় বাহিনী ··· দিল্লী থেকে আসছে খাস ফিরিঙ্গী রেজিমেণ্ট, লাহোর থেকে রওয়ানা দিয়েছে এক পাহাড়ী খচ্চরের বাহিনী।

এ যেন বিরাট একটা লড়াইয়ের প্রস্তুতি। পঞ্জাবের মুক্ত প্রাণের শির দাঁড়াকে যেন ওরা ভেঙে গুঁড়ো গুঁড়ো করে দিতে এবার বদ্ধ পরিকর।

উৎকণ্ঠিত হয়ে উঠতে লাগল রাম সিংয়ের ঘনিষ্ঠ সুবা সহযোগীরা। সারা আশ্রমে, আশ্রমের সামনে কুকাদের জটলায় একটা চাপা উৎকণ্ঠা ও উত্তেজনা। ঘণ্টায় ঘণ্টায় নানা খবর আসছে। বাড়ছে কুকাদের জমায়েৎ।

সূর্য ঢলে পড়েছে তখন মাথার ওপর থেকে পশ্চিমে। এমন সময় দেখা গেল বিহঙ্গম নারায়ণ সিংয়ের ঘোড়া ছুটে আসছে তীব্র বেগে। আশ্রমের সামনে এসে থামল জটলার সামনে। হেঁকে বললে, 'তোমরা এক্ষুনি এখান থেকে চলে যাও। জল্‌দি—জল্‌দি, ফৌজ আসছে।'

জটলার মধ্যে থেকে সমবেত একটা ধ্বনি বেরিয়ে এল :

'আমরা লড়ব !'···

'ওরা আশ্রম খানা তল্লাস করতে আসছে—লড়তে নয়।' নারায়ণ সিং বলল, 'আর গোলমাল না পাকিয়ে তোমরা জল্‌দি এখান থেকে চলে যাও। গুরুজীর বিপদ সৃষ্টি করোনা।'

দোমনা কুকার দল জটলা ভেঙে আস্তে আস্তে সরে যেতে লাগল নারায়ণ সিংয়ের কথায়।

নারায়ণ সিং আশ্রমে ঢুকলো। রাম সিংয়ের ঘরে সভা বসলো হাজির সুবাদের নিয়ে।

ঘরের দরজা বন্ধ করে কি আলোচনা হলো ওদের, আশ্রমের সাধারণ

আশ্রিতরা জানতে পারল না। শুধু নির্দেশ এল—আশ্রম ছেড়ে এখুনি চলে যেতে হবে সকলকে। আগে মেয়েরা। নারায়ণ সিংয়ের নির্দেশ ভাসতে লাগল হাওয়ায়:

'মায়েরা ··· বহিনরা ··· বেটিরা ··· এখুনি তৈরী হও ··· গ্রামে চলে যাও। জল্‌দি—জল্‌দি।··· গরু ভৈঁসগুলোকে মাঠের দিকে তাড়িয়ে দাও, উটগুলোকে জঙ্গলের দিকে খেদিয়ে দাও—ঘোড়াগুলোকে আস্তাবল থেকে পাহাড়ের দিকে খেদিয়ে দাও। জল্‌দি ··· জল্‌দি।···'

ঘিরে এল মৃত খালসা সৈনিকদের মায়েরা, মেয়েরা, বউয়েরা—বলল, 'আমরা কোথায় যাব সিংজী।'

নারায়ণ সিং শুধু বললে, 'ফিরিঙ্গীরা তোমাদের বেইজ্জৎ করতে পারে। ওরা এসে পড়ল বলে।··· এখন তোমরা গ্রামের দিকে চলে যাও। গ্রামের কৃকারা তোমাদের ভার নেবে!'

পড়ে রইল আশ্রমের শূন্য লঙ্গরখানা, পড়ে রইল জোয়ারের আধ-সেঁকা রুটি, থেমে গেল গম পেষাই চাকির শব্দ, অসমাপ্ত পড়ে রইল শালের উপরে নক্সা। মেয়েরা তাদের সামান্য জামা-কাপড় গুছিয়ে নিয়ে পোঁটলা বাঁধল। এ আশ্রমের আশ্রিত তারা—নিজের ধন দৌলত বলতে ছিল না কিছুই। চোখ মুছতে মুছতে চলে গেল তারা গ্রামের দিকে।

দেবী তখনো কাঠ হয়ে বসে আছে নিজের কুঠরির সামনে। তার হাত-পা যেন অবশ হয়ে গেছে। সামান্য কয়েক খানা সালোয়ার কামিজ আর ছেলেদের পিরান ছড়িয়ে আছে সুমুখে—তখনও পোঁটলা বাঁধা হয়নি। ছেলে দুটো কাছে নেই—কোথাও হয়তো খেলা করছে আশপাশে। মুস্কিল হলো দেবীকে নিয়ে।

নারায়ণ সিং এসে তাড়া দিলে, 'অমন করে বসে থেক না দেবী।'

দেবী তাকাল ফ্যাল ফ্যাল করে নারায়ণ সিংয়ের দিকে—আস্তে আস্তে বলল, 'আমি কোথায় যাব খালসাজী—আমার কে আছে!'

না, তার কেউ নেই—পিম্পল গাঁও তার কাছে শূন্য হয়ে গেছে। ··

নারায়ণ সিং প্রবোধ দিয়ে বলল, 'পিম্পল গাঁওয়ে পঞ্জাব তো একটা ঘর তৈরী করে ছিল। ··· তা ছাড়া কে জানে, পঞ্জাব সিংয়ের ঠিক কী হয়েছে। আমরা সব খবর এখনও পাইনি। তোপ দেগে যাদের উড়িয়ে দেওয়া হয়েছে পঞ্জাব তাদের মধ্যে ছিল না। হয়তো সে গা-ঢাকা দিয়েছে। হয়তো সে ফিরে আসতেও পারে কোন দিন।'

'সিংজী!' ··· দেবীর বাষ্প রুদ্ধ কণ্ঠে হঠাৎ একটা তীব্র তিরস্কার ফে'টে পড়ে ক্ষোভে, দুঃখে।

এমন সময় বাইরে কোথায় উধম আর হরনামের চেঁচানি শোনা যায় :

'বিজ্‌ল ··· বিজ্‌লী ··· মা !' ···

চমকে ওঠে দেবী।

নারায়ণ সিং পঞ্জাবের ঘোড়ার নাম জানে। দ্রুত বাইরে বেরিয়ে গেল। পঞ্জাব সিং ফিরে এল কী !

উধমের ডাক শোনা গেল, 'মা দেখ—বিজ্‌লী এসে গেছে।'

বিজ্‌লী ডেকে উঠেছে বাইরে—পা ঠুক্‌ছে।

ছেলে দুটোর গলা ছাড়া আর কারুর গলা শোনা যাচ্ছে না। কেমন একটা দুর্নিবার আকর্ষণ যেন তার অসাড় শরীরটাকে আজ আস্তে আস্তে বাইরে টেনে নিয়ে গেল।

বিজ্‌লী দাঁড়িয়ে আছে—চারি দিকে চোখ চারিয়ে যেন কাকে খুঁজছে সে। হাঁটু পর্যন্ত কাদা পাঁক শুকিয়ে গেছে, চিকন সাদা গায়ে জমাট রক্তের দাগ কোথাও শুকিয়ে কালো হয়ে গেছে—কোথাও এখনও তার ভয়ংকর রক্তিম আভাস বীভৎস একটা কাণ্ডের নির্মম চিহ্নের মত জ্বল্‌জ্বল্ করছে। ঘাড়ের কেশর এলোমেলো, মাটিতে লুটোচ্ছে ধুলো কাদায় মাখা চামড়ার লাগাম। বসে যাওয়া চোখে ওর কত দিনের অনাহার যেন দাগা। কোথায় কত দূর থেকে ঘুরে ঘুরে, ছুটে ছুটে, খুঁজে খুঁজে ফিরেছে সে প্রান্তর থেকে প্রান্তরে। জিন তার শূন্য। ··· আজ তার সওয়ার নেই।

'বি ··· জ্‌লী !'

আজ যেন অনেক কথা বলার ছিল ঘোড়াটাকে—কিন্তু সব কথা আটকে গেল দেবীর। হঠাৎ মাথার ভেতরটা কেমন যেন ফাকা হয়ে গেল। বিজ্‌লীর গলার কাছে মাথা ঠেকিয়ে চোখ বুজ্‌লো দেবী। অনেক দিন পরে—অনেক ··· অনেক দিন পরে, বহু দিনের যে চোখের জল জমাট হয়ে গিয়েছিল, যার খবর কেউ রাখেনা —আজ গলে অবাধে ঝর ঝর করে ঝরে পড়তে লাগল।

নারায়ণ সিং শুধু গম্ভীর গলায় আস্তে আস্তে বলল, 'ঠিক সময়েই তোমার বিজ্‌লী এসেছে দেবী। আর দেরি করোনা বেটি—ছেলেদের নিয়ে এবার রওয়ানা দাও।'

নতুন জরুরী খবর এনেছে আবার এক কুকা ডাকহরকরা : খাস লুধিয়ানা থেকে সিপাহী ফৌজ রওয়ানা দিয়েছে ভাইনা লক্ষ্য করে। ওদের পৌঁছুতে আর দেরি নেই। ব্যস্ত হয়ে সে খুঁজছে নারায়ণ সিংকে।

নির্বাক অচঞ্চল রাম সিংকে ঘিরে বসে আছে কয়েকজন অত্যন্ত কাছের মানুষ

আর কয়েকজন অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ বিশ্বস্ত সুবা প্রতিনিধি মাত্র। হঠাৎ যাদুমন্ত্রে থেমে গেছে যেন আশ্রমের সব কলরব। আশ্রম প্রায় ফাঁকা। যেন পরিত্যক্ত—বর্জিত। মনে হয় কোন এক দৈত্য যেন বিরাট একটা জনশূন্য মহল্লা—তার গুরুদ্বার, তার শান বাঁধানো ছায়াশীতল কুয়োতলা, তার মস্ত লঙ্গরখানা, তার প্রশস্ত খামার, তার বিস্তৃত বাথান—সব খেলার ছলে বসিয়ে দিয়ে গেছে লোকশূন্য, শব্দশূন্য, বিশাল এক প্রান্তরের মাঝখানে। শুধু একটা সাদা নিঃসঙ্গ নিশান শীতের হাড় কাঁপানো হাওয়ায় পৎ পৎ করে উড়ছে গুরুদ্বারের চূড়োয়।

ফিরিঙ্গী শাসকের সবটুকু দৃষ্টি আজ একটি জায়গায় কেন্দ্রীভূত—সে হলো ভাইনীর গুরুদ্বার। অত্যন্ত ত্বরিৎ গতিতে সারা পঞ্জাব জুড়ে ইতিমধ্যে বন্দী করা হয়েছে বহু কুকা সদস্য ও সুবাদের। তাদের নানা চিঠিপত্র এজাহার বিবৃতির স্তূপ ঘণ্টায় ঘণ্টায় জমে উঠছে থানায় থানায়। সে সব থেকে ফিরিঙ্গী শাসকদের বুঝতে এতটুকু দেরি হয়নি যে গ্রামে শহরে, সমাজের নীচু তলা থেকে উপরে, সাধারণ নাগরিক থেকে কোম্পানীর পল্টনে ঢুকে-পড়া সৈনিকদের মধ্যে শতাব্দীর শেষ মুক্তি-যুদ্ধের কতবড় একটা প্রত্যাশা গুরু রাম সিংয়ের একটি ছোট্ট নির্দেশের জন্য প্রতীক্ষা করে ছিল। শুধু তখনও ধরা পড়েনি সুদূর রাশিয়া অভিমুখী সেই নিঃসঙ্গ বৃদ্ধ সংবাদবাহী যাত্রী সর্দার গুরুচরণ সিং।

শীতের সূর্য তখন পাটে বসছে। বিষণ্ণ আলোয় রাঙা হয়ে উঠেছে পশ্চিমাকাশ।

আশ্রমের পেছন দিকে আজ বিজলী এ আশ্রমের বোধ করি শেষ দানাপানী খেয়ে সেজে দাঁড়িয়েছে পিঠে নতুন দুই সওয়ার নিয়ে—যেন দুটো তুলোর পুঁটলি। বাচ্চা দুটো হঠাৎ যেন ঘটনা বিপর্যয়ে একেবারে চুপ হয়ে গেছে। নারায়ণ সিং নিজেই তোড়জোড় করে চাপিয়ে দিয়েছে তাদের ঘোড়ার পিঠে। নিজেই বেঁধে ঝুলিয়ে দিয়েছে ওদের জামা কাপড়ের পোঁটলা।

যাত্রার মুহূর্তে নারায়ণ সিংকে প্রণাম করে দেবীর চোখ আবার বুঝি ছলছলিয়ে এসেছিল। নারায়ণ সিং ধীর কণ্ঠে বললে, 'আজ কান্না নয় দেবী—মনে রেখ, দরবারা সিং সুবা তোমার শ্বশুর, ধিয়ান সিং তোমার বাবা! তাদের কথা শুনিয়ো তোমার ছেলেদের—ওদের মানুষ ক'রে তুলো তাঁদের আদলে। বসো—দুটো জিনিস দিতে ভুলেছি—' বলে নারায়ণ সিং ছুটে গেল আশ্রমের ভেতরে। ফিরে এল একটা পাহাড়ীদের ধারালো টাঙি আর একটা নেপালীদের কুকরী নিয়ে। ও সব অস্ত্র-বাতিক দরবারার সংগ্রহ! দেবীর হাতে সে দুটো ধরিয়ে দিয়ে বললে, 'এ দুটো তোমার শ্বশুরের সংগ্রহ দেবী। এতদিন আশ্রমে ছিল। তোমার

ছেলেরা বড় হলে তাদের দিয়ো। এবার রওনা দাও—আর দেরি না, সিধা দক্ষিণের পথ।'

বিজ্‌লীর সে পথ চেনা—অনেকবার ওপথে আসা যাওয়া করেছে সে। সে-ই পা বাড়াল আগে, পাশে লাগাম ধরে দেবী। নির্বাক।

বিহঙ্গম নারায়ণ সিং দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছিল—দরবারা সিংয়ের শেষ চিহ্নটুকু যেন ধীরে ধীরে অস্পষ্ট হয়ে যাচ্ছে চোখের সামনে থেকে।···

এমন সময় কানে এসে লাগল অনেকগুলো ঘোড়ার খটাখট্ ক্ষুরের শব্দ। নারায়ণ সিং দ্রুত আশ্রমে গিয়ে ঢুকল।

ধুলোর ঝড় উড়িয়ে উত্তর থেকে এসে পড়েছে লুধিয়ানার ফৌজ সেপাইয়ের দল। সঙ্গে ওয়ারেন্ট: নামধারী নেতা রাম সিং বন্দী। বন্দী হলো হাজির ক'জন ঘনিষ্ঠ পার্শ্বচর সুবাও। অভিযোগ গুরুতর: পঞ্জাবে ফিরিঙ্গী শাসনের বিরুদ্ধে দেশব্যাপী বিরাট এক বিদ্রোহের ষড়যন্ত্র। পরিণাম: সুদূর ব্রহ্মদেশে চিরনির্বাসন।···

শীতের বিষণ্ণ ছায়া নেমে আসছে তখন সারা পঞ্জাবের আকাশ জুড়ে। দেবীর চোখের সামনে দূরে বনসীমার কাছে ঘন কুয়াশার সাদা আস্তর একটা লেপে দিয়েছে কে যেন। পিম্পল গাঁওর পথ কোথায় হারিয়ে গেছে তার মধ্যে কে জানে!

সামনে সন্ধ্যা। কে জানে—দেবী সে পথ খুঁজে পাবে কিনা। অনির্দিষ্ট ভবিষ্যৎ। পিম্পল গাঁওর সেই হারানো দিনের সুখ শান্তি সাথী—তাও কী সে আর পাবে এক পুরানো সঙ্গী বিজ্‌লী ছাড়া!

বিজ্‌লীর গায়ে একটা হাত আলতো বুলোতে বুলোতে কান্না-ভাঙা গলায় দেবী বিড় বিড় করে শুধু বললো, 'বিজ্‌লী ··· বেটা!'—